হিরণ্যগর্ভ
একাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
৩০শে আষাঢ়, ১৪২৫

Hiranyagarbha
Volume 11, No. 2
हिरण्यगर्भ
एकादश वर्ष, द्वितीय संख्या
तारिख-१५ जुलाई,२०१८

৩০শে আষাঢ়, ১৪২৫ 15th July, 2018

সূচীপত্র a Contents

বাংলা বিভাগ ঃ—	শ্রীশ্রীসূর্য্য নারায়ণ	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	05
	জীবনাভাস	শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়	08
	জ্ঞানগঞ্জের যোগ প্রসঙ্গে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	09
	নরপতি ক্ষুপ	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	10
	যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা	শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়	11
	ত্রিপুর দৈত্যের কাহিনী	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	12
	কলি যুগে ভক্তি দেবী শ্রেষ্ঠ	শ্রীগৌর গোপাল ঘোষ	13
	শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের পত্রাবলী	বৃহৎ কিশোরী ভাগবত	15
	গীতা ভাবনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	16
	শ্রীশ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক কথা	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	17
	গুরুগীতা	যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	18
	শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম বদ্রীনাথধাম ভ্রমণ কথা	স্বামী সংবেদানন্দজী	19
	যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	22
	নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	23
	হয়গ্রীব মাধব - হাজো	স্বাধ্বী অনুভানন্দময়ী	24
हिन्दी विभाग ঃ—			
	श्रीश्री सूर्य-नारायण	श्रीमती ज्योति पारेख	27
	श्रीश्रीमाँ की प्रथम बद्रीनाथधाम यात्रा	श्रीमती ज्योति पारेख	30
	नरपति क्षुप	श्रीमती ज्योति पारेख	33
	कलियुग में भक्ति देवी श्रेष्ठ	श्रीमती ज्योति पारेख	34
	उन्मेष	श्रीमती सुशीला सेठिया	36
	गुरुगीता	श्रीश्रीमाँ सर्वाणी	37
	श्रीश्रीमाँ का आध्यात्मिक कथोपकथन	श्रीमती ज्योति पारेख	38
	श्रीश्रीभगवान किशोरी मोहन की पत्रावली	श्रीविमलानन्द	39
	योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक	श्रीविमलानन्द	40
	योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा	श्रीचंद्र पारेख	41
	ज्ञानगंज के योग प्रसंग पर	श्रीविमलानन्द	43
	त्रिपुर दैत्य की कहानी	श्रीमती ज्योति पारेख	44
English Section ঃ—			
	Surya-Narayan – Soul's Luminous Alter-Ego	Prof. Partha Pratim Chakrabarti	45
	Gems from the Garland of Letters	Sri Arnab Sarkar	48
	Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo	Dr. Barun Dutta	50
	Biography of Manicklal Dutta	Dr. Barun Dutta	52
	Unmesh	Dr. Durgesh Chakrabarty	53
	The Philosophy of Truth	Dr. Barun Dutta	55

ISBN No. 978-81-935091-6-6 Cover : Sri Sri Surya Narayan

Printed and Published by Dr. Barun Dutta on behalf of Mata Sharbani Trust, Plaza Housing, Vill : Jagannathpur (Shibrampur), P.O. : Ashuti, Pin : 700141, 24 Parganas (South), West Bengal, India. Tel : (033) 2488-1826, website : www.akhandamahapeeth.org, Email : akhanda.mahapeeth@gmail.com. Printed at : Rama Art Press, 6/30, Dum Dum Road, Kolkata-700 030, Tel : 2557-4419

Editor : Shri Arnab Sarkar • Associate Editors : Smt. Keya Chakraborty and Shri Mohit Shukla

সম্পাদকীয় / Editorial

সঘন বর্ষার শ্যামল গরিমা আচ্ছাদিত আকাশপটে মেঘডম্বরু নিনাদিত। বর্ষার সজল বারিধারায় স্নাত হয়ে ভক্তিবিনম্র চিত্তে আমরা পালন করেছি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা ও শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জন্মতিথি।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুণ্য রথযাত্রা ও শ্রীশ্রীগুরু পূর্ণিমার পুণ্য লগ্ন সমাগত। পরমপুজ্য শ্রীশ্রীনাঙ্গাবাবা, মহাবতার বাবাজী মহারাজ, শ্রীশ্রীলাহিড়ী মহাশয় ও অন্যান্য সকল গুরুমহারাজগণের শ্রীচরণে আমরা আজ প্রণতঃ হই ও ভক্তিবিনম্রচিত্তে প্রার্থনা করি যে চতুস্পার্শের পঙ্কিলতামুক্ত চিত্তের শুদ্ধতা, সততা, নিঃস্বার্থতা ও সমর্পণের বারিধারা যেন আমাদের অন্তঃকরণে স্বতঃ প্রবাহিত থাকে।

হিরণ্যগর্ভের এই সংখ্যাটি আমরা নিবেদন করেছি জগতের প্রাণজ্যোতি-স্বরূপ দিবাকর সূর্যদেবকে। এই সূর্য জড় জ্যোতিঃপুঞ্জ নন — ইনি সূর্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মপুরুষ — স্থাবর ও জঙ্গম সকল বস্তুর ইনি প্রাণস্বরূপ। কাশ্যপেয় আদিত্য নিত্য উদয়ে মনুষ্য জগতকে কর্মে প্রবৃত্ত করেন। তিনি চির জ্যোতিষ্মান, লোকপাল, নবগ্রহাদির মুখ্য, বেদস্তুত দেব। আবার যোগভাষ্যে তিনি মণিপুর-চক্রে বিষ্ণুনাভির জ্যোতি দ্বারা স্বতঃ সঞ্জীবিত।

হে বিবস্বান, হে মহাদ্যুতিম্ - আজ গুরুপূর্ণিমার পুণ্য লগ্নে আমরা আপনার শ্রীচরণে প্রণতঃ হই ও আপনার বরাভয় প্রার্থনা করি যেন আপনার অনন্ত প্রাণময় জ্যোতিপ্লাবনে আমাদের মনের সকল কলুষতা ও সঙ্কীর্ণতা ধৌত হয়ে, জ্ঞান ও ভক্তির আলোকবর্তিকা আমাদের অন্তঃকরণে স্বতঃ প্রজ্জ্বলিত হয়।

— ওঁম্ হরি তৎ সৎ ওঁম্ —

It is the month of Shravana. One can hear the claps of thunder from dark monsoon clouds as they saddle the horizons of the sky. With rains as the backdrop, we have just concluded celebrating the auspicious Snan Yatra of Lord Jagannath and the holy birthday of Sree Sree Maa, amidst piety and verve.

The auspicious Ratha Yatra and Shri Shri Guru Purnima are just a few days away. We bow in obeisance to Shri Shri Nanga Baba, Mahavatar Babaji Maharaj, Shri Shri Lahiri Mahashay and all other Gurus on this auspicious occasion and pray on Their lotus feet to seek their blessings for purity, honesty, selflessness and dedication in our heart, free from the vices of our surroundings.

We have dedicated this edition of Hiranyagarbha to the Sun God Divakara who is the source of all forms of life in this world. This Sun is not the celestial star which we see every day. He is the Divine God living in the Surya Mandal and is the ultimate source of energy of all beings in this world... living or inert. In the mortal form, He is the son of Maharshi Kashyap and his consort Aditi... this is why He is addressed as Kashyapeya or Aditya. He is ever luminescent, one of the Lokapalas, the chief deity amongst the Navagrahas and has been immortalized through Vedic hymns. In Yogic realm, He is the God who remains inside the Manipura Chakra of our body and is ever-vitalized by the sublime power of Vishnu Nabhi.

O Lord Vivaswan (Sun God), we offer our humble obeisance to your Lotus Feet on the auspicious occasion of Guru Purnima and seek your kind blessings to cleanse our heart of all vices and pettiness, washed by the glorious incessant life-force that emanates from you and to kindle the flame of knowledge and devotion in our inner being.

শ্রীশ্রীসূর্য্য নারায়ণ

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

প্রাচীন আর্য্য ঋষিদের অন্যতম প্রধান উপাস্য দেবতা 'সূর্য্য'। আর্য্য জাতির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় ইঁহার উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, ইনি গ্রীকদের Helios, লাতিনদের Sol, টিউটনদের Tyr, ইরানীয়দের 'খুরসেদ'। সূর্য্যদেব সম্বন্ধে বহু ঋষি বহু ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। সূর্য্য, সবিতা, আদিত্য, বিবস্বান, বিষ্ণু — এই পাঁচটি বিভিন্ন নামে সূর্য্যের স্তুতি দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময়ে ও মহিমায় এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন নামে সূর্য্যকে চিহ্নিত করা হইয়াছিল। যাস্কের মতে, আকাশ হইতে যখন অন্ধকার অপসারিত হয়, তখন কিরণ বিস্তৃত হয়, সেই সময় হইল সবিতার কাল। সায়নের মতে, সূর্য্য উদয়ের পূর্বে যে মূর্তি তাহাই সবিতা আর উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত যে মূর্তি, সেটিই সূর্য্য। ('সবিতা' অর্থে দেবতাদের প্রসবিতা; সকল ভূতের ও সকল ভাবের জন্মদাতা বলিয়া 'সবিতা') এই সূর্য্যের উদয়গিরিতে আরোহণ, মধ্যগগনে স্থিতি এবং অস্তাচলে অস্তগমন, এই তিন অবস্থা বিষ্ণুর পদ-বিক্ষেপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। 'বিবস্বান' সূর্য্যের আরেকটি নাম। 'বিবস্বান' শব্দে আকাশকে বুঝায়। ইনি উদীয়মান সূর্য্য; বেদ-এ ইনিই প্রথম যজ্ঞকর্তা। অহোরাত্র বিভাগের কর্তা অর্যমা; তিনি মিত্র ও বরুণের (দিবা ও রাত্রির) মধ্যবর্তী দেবতা বলিয়া পরিচিত।

শ্রীশ্রীসূর্য্য নারায়ণ

ঋগ্বেদের ১০ টি সূক্তে সূর্য্যের স্তুতি রহিয়াছে। ঋগ্বেদে সূর্য্যই ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি। এই সূর্য্য জড় জ্যোতিঃপিণ্ড নন, ইনি সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী দেবতা যিনি হইলেন ব্রহ্মপুরুষ। বেদে অগ্নির মতো সূর্য্যকে সর্বত্র একইভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে কারণ অগ্নিই সূর্য্য। সূর্য্য প্রত্যক্ষ দেবতা, সাক্ষাৎ বিষ্ণু স্বরূপ। সূর্য্যই জগতের আত্মা, মহান আত্মা বলিয়া পরিচিত। আলোক উদ্ভাসিত আকাশ ইঁহার মুখ, সূর্য্য মণ্ডল ইঁহার চক্ষু; ইনি হিরণ্যপাণি, সর্বদর্শী বিশ্বভুবনের চর, মর্ত্যজনের সৎ ও অসৎ কর্মের সাক্ষী। সপ্তাশ্বযোজিত একচক্র রথে তিনি বিশ্ব পর্য্যটন করেন। (সূর্য্যরথে একটি চাকা, তিনটি নাভি। সূর্য্যের সপ্তঅশ্বরথ প্রসিদ্ধ। সায়নের মতে ঐ সপ্তঅশ্ব অর্থে বায়ুর সাতটি রূপ বা সপ্ত রশ্মি বা ছয়টি ঋতু ও একটি অধিমাস। তিনটি নাভি অর্থে গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্ত বা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান কাল। এক চাকা অর্থে এক বৎসর বা হংসের একটি পাদ। এই জাতীয় বহু ব্যাখ্যা রহিয়াছে সূর্য্যরথের।) বরুণ এনার পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। সূর্য্যশক্তি মনুষ্যদিগকে কর্মে প্রবর্তিত বা জাগ্রত করেন। স্থাবর ও জঙ্গম সকল পদার্থের ইনি প্রাণস্বরূপ। সমগ্র প্রাণী ইঁহার অধীন, ইনি বিশ্বস্রষ্টা। সূর্য্যের মাতা দ্যৌঃ বা অদিতি। ধাতা সূর্য্য ও চন্দ্রকে তাঁহার চিন্ময় কল্পনা দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। অশ্বিদ্বয় সূর্য্যের পুত্র। ঊষা সূর্য্যের জনয়িত্রী; সূর্য্য প্রণয়ীর ন্যায় এই সুন্দরী দেবীর অনুগমন করেন। সূর্য্য ঊষার কোলে দীপ্তি পান, আবার ঊষা এনার স্ত্রী। সূর্য্য বিরাট পুরুষের চক্ষু হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। উনি আকাশে পক্ষীর ন্যায় বা উজ্জ্বল অশ্বের ন্যায় বিচরণ করিয়া থাকেন। ইনি আকাশের পরমরত্ন, উজ্জ্বল অস্ত্র, রথের চক্র। মিত্রাবরুণ ইঁহাকে মেঘ ও বৃষ্টি দ্বারা আবৃত করেন। ইন্দ্র সূর্য্যকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রথচক্র হরণ করেন অর্থাৎ মেঘে সূর্য্যমণ্ডল আবৃত হইয়া পড়ে। স্বর্ভানু রাক্ষস অন্ধকারে সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়া গ্রহণ করে; মহর্ষি অত্রি সূর্য্যকে মুক্ত করিয়া আবার আলোকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অথর্ব্ববেদে রাহুর উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায়। রাহু লোকহিতকর সাধকগ্রহদিগের অন্যতম। সূর্য্য সময়ের সৃষ্টিকর্তা। ইনি ৩৬০ দিনে সম্বৎসর গঠন করেন। সূর্য্যচক্রে ১২ টি অরা বা মাস আছে। সেটি আকাশে ৭২০ বার (৩৬০ দিন ও ৩৬০ রাত্রি) আবর্তিত হয়। অথর্ব্ববেদে ও আরণ্যকে সপ্ত সূর্য্যের উল্লেখ আছে। ইহা ঋগ্বেদের সপ্তাশ্ব ও সপ্তরশ্মি।

কূর্মপুরাণে আছে, প্রকৃতি প্রসূত অণ্ড হইতে ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক উৎপন্ন হইয়াছে। সূর্য্য ও চন্দ্রের রশ্মি যতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ততদূর পর্য্যন্ত ভূর্লোক বলিয়া কথিত হয়। ভূমি হইতে লক্ষযোজন ঊর্ধ্বে সৌর মণ্ডলের অবস্থান আর তাহার লক্ষযোজন ঊর্ধ্বে চন্দ্রমণ্ডল অবস্থিত। সবিতার ব্যাস ৯ সহস্র যোজন এবং তাহার মণ্ডলের পরিধি উহার তিনগুণ। সূর্য্যের সাতটি অশ্ব; যথা — গায়ত্রী, বৃহতী, উষ্ণীক, জগতী, পংক্তি, অনুষ্টুপ ও ত্রিষ্টুপ।

সূর্য্যেরই অন্য একটি নাম 'আদিত্য', তথাপি অনেক স্থলে আদিত্য হইতে সূর্য্যকে পৃথক কল্পনা করা হয়। প্রধানতঃ অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, ধাতা, ভগ, বিবস্বান, পূষা, ত্বষ্টা, বিষ্ণু, অংশ, সবিতা ও শক্র, আদিত্যের এই দ্বাদশটি নাম পাওয়া যায়। সূর্য্য ক্রমান্বয়ে বসন্তাদি ঋতুতে ঐ দ্বাদশ আদিত্যকে আশ্রয় করেন। পুলস্ত্য, পুলহ, অত্রি, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, ভৃগু, ভরদ্বাজ, গৌতম, কশ্যপ, ক্রতু, জমদগ্নি ও কৌশিক, এই দ্বাদশ জন ব্রহ্মবাদী ঋষি পবিত্র বেদমন্ত্র দ্বারা দ্বাদশ আদিত্যের স্তব করিয়াছেন। প্রতি বৎসর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মধ্যে আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা একশত অশীতি-মণ্ডল দ্বারা সূর্য্যের যে গন্তব্যপথ আছে, সেই পথে সূর্য্যরথ গমন করে, তাহাতে প্রতি মাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য দেবগণ বিষ্ণুতেজে বর্দ্ধিত হইয়া ঋষিগণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, যক্ষ, নাগ ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। রথকৃৎ, প্রহেতি, মিত্র বরুণ, বশিষ্ঠাদি প্রভৃতি গ্রামনীগণ যথাক্রমে সূর্য্যের রশ্মি সংযম করিয়া থাকেন। হেতি (অপ, বাত) প্রভৃতি রাক্ষসগণ সূর্য্যের পশ্চাতে গমন করেন। বাসুকী প্রভৃতি নাগগণ রথের অলঙ্কার রূপে বিরাজমান থাকিয়া দ্বাদশ আদিত্যকে বহন করেন। তম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্বগণ আদিত্যের দ্বাদশ গায়ক। ঋতুস্থলা (অনুম্লোচা) প্রভৃতি অপ্সরাগণ নৃত্যগীত দ্বারা সূর্য্যকে পরিতুষ্ট করেন। যক্ষগণ রথের অশ্বরজ্জু ধারণ করেন এবং বালখিল্য মুনিগণ রথকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করেন।

ঋক্, সাম ও যজুর্বেদের নিদান স্বরূপ পঞ্চকালের ঈশ্বর প্রজাপতি দেবদিবাকর ব্রহ্মার পুত্র। তিনি দিবস মাস ও ঋতুর প্রবর্ত্তয়িতা এবং সকলের পিতামহ স্বরূপ। এই দেবভাস্কর হইতে কাল-বিভাগ, মাস, ঋতু, অয়ন, গ্রহ-নক্ষত্র, আয়ু কল্পিত হইয়া থাকে। তিনিই ভূতগণের উৎপত্তি ও বিনাশের সাধক বলিয়া ভাস্কররূপে কীর্ত্তিত হন। পরবর্তী যুগে দেখিতে পাওয়া যায় যে দেব বিবস্বান সূর্য্য, মহর্ষি কশ্যপ ও অদিতির পুত্র ছিলেন। তিনি প্রথমে এক অণ্ডাকারে প্রসূত হন। দীর্ঘকালের মধ্যেও যখন সেই অণ্ড স্ফুটিত হইল না, তখন ইহা দেখিয়া বিশ্বকর্মা (ত্বষ্টা) তাহা বিদারিত করেন। পিতা কশ্যপ ইহাতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া স্নেহবশতঃ বলিলেন, ''এ অণ্ড মরে নাই।'' সেইজন্য বিবস্বান তদবধি 'মার্তণ্ড' নামে কীর্ত্তিত হইলেন। তাঁহার পুত্রই 'বৈবস্বত মনু' (এই বৈবস্বত মনুই ইক্ষ্বাকুর পিতা; ইক্ষ্বাকু সূর্য্য বংশের প্রবর্তক) হইয়াছিলেন। রামায়ণ ও মহাভারত মতে, সূর্য্যদেব কশ্যপ ও অদিতির পুত্র ছিলেন। সেই কারণেই ইঁহার অন্য নাম হয় 'আদিত্য'। বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞার সহিত সূর্য্যের বিবাহ হয় এবং সংজ্ঞার গর্ভে বৈবস্বত মনু, যম ও যমুনা নামক তিনটি সন্তান হয়। সূর্য্যের প্রখর তেজ ও দ্যুতি সহ্য করিতে না পারিয়া সংজ্ঞা, স্বানুরূপা ছায়াকে সৃষ্টি করেন এবং স্বামীর সঙ্গিনীরূপে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়া উত্তর কুরুবর্ষে অশ্বারূপ ধারণপূর্বক ভ্রমণ করিতে থাকেন। ছায়া সূর্য্যের পরিচর্য্যায় রত হইলে ছায়াকে সংজ্ঞা মনে করিয়া সূর্য্য তাঁহার গর্ভে দুই পুত্র ও এক কন্যা উৎপাদন করেন। জ্যেষ্ঠ সাবর্ণি মনু, দ্বিতীয় শনি ও কন্যা তপতী। (চন্দ্রবংশীয় সংবরণের সঙ্গে তপতীর বিবাহ হয়।) পরে সংজ্ঞার শঠতা বুঝিতে পারিয়া সূর্য্য অশ্বরূপ ধারণকরতঃ উত্তর কুরুতে গিয়া সংজ্ঞার সহিত মিলিত হন, ফলে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হয়। অতঃপর সূর্য্যদেব সংজ্ঞাকে সূর্য্যলোকে ফিরাইয়া আনেন। বিশ্বকর্মা সূর্য্যের উগ্রতেজ হ্রাসিত করিবার জন্য তাঁহার দেহের অষ্টম অংশ ছেদন করিয়া দেন। এই কর্তিত অংশ জ্বলন্ত অবস্থায় পৃথিবীতে পতিত হইলে তখন বিশ্বকর্মা সেই জ্বলন্ত অংশদ্বারা বিষ্ণুর চক্র, শিবের ত্রিশূল, কুবেরের অস্ত্র, কার্তিকেয়র তরবারি ও অন্যান্য দেবগণের অস্ত্র প্রস্তুত করেন।

দেব সবিতা প্রত্যহ উদয় ও অস্তগমনকালে সুমেরু পর্বতকে প্রদক্ষিণ করিতেন। ইহা দেখিয়া বিন্ধ্যগিরি ঈর্ষান্বিত হইয়া সূর্য্যকে বলিলেন, ''তুমি প্রত্যহ যেইরূপ সুমেরুকে প্রদক্ষিণ কর, সেইরূপ আমাকেও প্রদক্ষিণ করিবে।'' সূর্য্যদেব বলিলেন যে তিনি স্বেচ্ছায় সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করেন না, বিশ্বস্রষ্টার আদিষ্ট পথেই তাঁহাকে ভ্রমণ করিতে হয়। বিন্ধ্যাচল সূর্য্যের কথায় ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহার গতিরুদ্ধ করিবার জন্যে

তখন আপন মস্তক উন্নীত করিয়া উত্থিত হইলেন। বিন্ধ্যগিরিকে এইভাবে রবির পথরোধ করিতে দেখিয়া দেবগণ উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং প্রথমে নানা প্রকার স্তোকবাক্যে বিন্ধ্যকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন। ইহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া দেবগণ অবশেষে মহর্ষি অগস্ত্যের শরণাপন্ন হইলেন। দেবগণের প্রার্থনায় অগস্ত্য তখন কৌশলে বিন্ধ্যগিরিকে নতশির করিলেন।

দিনপতি সূর্য্যদেব যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ দক্ষিণ দিক তাঁহার গুরু মহর্ষি কশ্যপকে প্রদান করেন। পূর্বদিকে সবিতা, দেবী সাবিত্রীর মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মবাদীগণকে আশ্রয় করেন। এই দিকেই ভাস্কর মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে যজুর্বেদ সমগ্র প্রদান করিয়াছিলেন। সূর্য্যদেব দক্ষিণদিকে গমন করিয়া সুরস জল সকল ক্ষয় করিয়া থাকেন এবং তিনি পুনরায় উত্তরদিকে গমন করিয়া হিম বর্ষণ করিয়া থাকেন। এই দক্ষিণদিকে 'চক্রধনু' নামে একজন মহর্ষি ভাস্কর হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই চক্রধনুই 'কপিলদেব' নামে বিখ্যাত।

জগতের প্রাণজ্যোতি দিবাকর সূর্য্যদেব নবগ্রহের অন্যতম। ইহা ছাড়া সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডল গ্রহ বলিয়াও কথিত হন। সূর্য্য গ্রহরাজরূপে পরিচিত। নবগ্রহ স্তবে তাই সূর্য্যকেই প্রথম নমস্কার করিতে হয়। মহর্ষি কশ্যপ তনয় সূর্য্য অগ্নি ও শিবরূপেও কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। সূর্য্যের পুত্র শনি। সৃষ্টি রক্ষার্থে স্রষ্টার নিয়মে সূর্য্য সকল গ্রহের নিম্নে বিচরণ করেন, পরন্তু ইঁহার দেবলোক সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থিত। সূর্য্যের উপরে সোম (চন্দ্র), তদুপরি নক্ষত্রমণ্ডল বিরাজিত। সূর্য্যের বিস্তার ৯ সহস্র যোজন এবং মণ্ডলের বিস্তার আরও তিনগুণ অধিক। তিনি ভাব্যলোকের অধিপতি বলিয়া কীর্ত্তিত হন। এই সৃষ্টিমধ্যে সূর্য্যদেব একজন লোকপাল। সূর্য্য রবের দেবতা তাই রবি নামে অভিহিত। মার্কণ্ডেয় পুরাণে সূর্য্যকে ওঙ্কার বলা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে আছে যে রাত্রিকালে সূর্য্যের প্রভা অগ্নিতে যায় আর দিবস কালে অগ্নির চতুর্থাংশ সূর্য্যে চলে আসে; ফলে, সূর্য্য প্রখর হইয়া ওঠে। বিষ্ণু-শক্তির প্রভাবেই অহোরাত্রের কারণরূপে সূর্য্য পরিবর্তিত হইতেছেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন —''আনন্দধারা বহিছে ভুবনে, কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে। পান করে রবি-শশী অঞ্জলি ভরিয়া, সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি।'' — আমাদের দেহের অভ্যন্তরে মস্তকের সহস্রারে সোমমণ্ডল এবং নাভি কেন্দ্রে মণিপুর ব্রহ্মচক্রে বিষ্ণুনাভির তেজগ্নি দ্বারা সঞ্জীবিত সূর্য্যমণ্ডল রহিয়াছে। সোমমণ্ডল হইতে অমৃতরস বিন্দু পতিত হইয়া নাভিতে সূর্য্যকুণ্ডে আসিয়া পড়িলে সূর্য্যের অগ্নিময় তেজে ওজঃ ধাতুতে পরিণত হইয়া সমগ্র দেহে ছড়াইয়া পড়িয়া যোগীর দেহকে ওজস্বী করিয়া তোলে। যৌগিক ভাষায় ইহাকে 'হঠ' বলা হয়। এই 'হঠ' অবস্থাপ্রাপ্ত হইলে যোগীর সত্তায় অমৃতের সঞ্চার হয়। সূর্য্য ও চন্দ্রের সমরস্যতায় এই সমস্ত সৃষ্টির ধারা সঞ্চালিত হইতেছে। মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করুক বা না করুক, গগনে উদ্ভাসিত অম্লানজ্যোতিরূপী সূর্য্যকে বা সূর্য্যদেবতাকে সকলকে স্বীকার করিতেই হয়। —

'তং সূর্য্যং জগতাং নাথং জ্ঞান-বিজ্ঞান মোক্ষদম্।
তং সূর্য্যং জগৎকর্তারং মহাতেজঃ প্রদীপনম্।
তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্।।'

দিব্যতেজাগ্নি

মহাকাশে বিরাজিছে জ্যোতির্ময় ভাস্কর
ত্রিজগতের প্রাণপতি নিখিল বৈশ্বানর
সর্ব সৃষ্টির পরম কারণ, সর্ব শক্তি প্রদাতা
সর্ব কলুষ নাশকারী, সর্ব প্রাণের বিধাতা
প্রণমি তোমারে অর্চিষ্মান ভৌত-যজ্ঞ প্রণেতা।

হুতাশন রূপে রবি-শক্তি প্রকাশিছে ধরামাঝে
অসীম তেজের মহা মহিমায় সকল অণুতে রাজে
শ্রৌত-স্মার্ত কর্মের মাঝে একাধীশ্বর রূপে
বহ্নি শিখায় সাদরে স্বীকারো 'স্বাহা'রূপ আহুতিকে
প্রণমি তোমারে পূত-পাবক জ্ঞান-যজ্ঞ প্রদাতা।।

মানব-অন্তরে তেজোময় রূপে নিবাসিছে মণিপুরে
প্রাণ-অপানের আহুতিতে জাগে শিখারূপে হৃদিজুড়ে
মহা-বিশ্বের সংযোগ রূপ সৌর কিরণ মাঝে
বিশ্ব-প্রাণের চেতনার বীণা মন্দ্র-মন্ত্রে বাজে।
প্রণমি তোমারে আদিদেব রূপে আত্ম-যজ্ঞ নিয়ন্তা।।

—মাতৃচরণাশ্রিতা শ্রীমতী কেয়া চক্রবর্তী

জীবনাভাস

মহাবতার বাবাজী মহারাজের শিষ্য শ্রীমাণিকলাল দত্তের জীবনী

(৬)

কানু জংশন ও ভূতনাথবাবুর সহিত পরিচয়—(পূর্ব প্রকাশিতের পর.....)

—যাঁহার অসামান্য অবদানে মাণিকলালের পরবর্তী সাধনার জীবন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই নিষ্ঠাবান, সদালাপী, অতিথি বৎসল ও সাধক ভূতনাথবাবুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবারণার্থে এস্থলে নিবেদন করা অপরিহার্য্য মনে করিতেছি। এই ভূতনাথবাবু ছিলেন কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্যালক। দুর্গাচরণ ডাক্তারের চিকিৎসালয়ে তিনি কম্পাউণ্ডারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ডাক্তারবাবু পেশা হইতে অবসর গ্রহণের বাসনা প্রকাশ করিয়া একদিন ভূতনাথবাবুকে বলিলেন যে, ''দ্যাখ্ ভূতো, তুইতো পাশ করা ডাক্তার নোস্ যে ডাক্তারী করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারবি; সে কারণে আমি তোকে একটা ফরমূলা দিচ্ছি, যার দ্বারা একটা পাঁচন তৈরী করে ম্যালেরিয়া কবলিত বাংলার পল্লীগ্রামে বিক্রয় করলে তোর প্রভূত অর্থোপার্জন হবে। তবে হ্যাঁ, একটা কথা তুই আমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর যে, ঐ পাঁচন বিক্রয় করে যেদিন তোর ছোট একটা ধামীর এক ধামী অর্থ উপার্জন হবে সেদিন তুই আর পাঁচন বিক্রয় করবি না।'' ভগ্নীপতি তথা প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা বশে ভূতনাথবাবু ডাক্তারবাবুর পদস্পর্শে তাহাই শপথ করিলেন। অতঃপর তিনি প্রস্তাবিত ফরমূলা লাভ করিলেন ও সেই পাঁচনের নামকরণ করিলেন 'জ্বরের কালান্তক মহৌষধ'। পরে এই কানু (বর্তমান থানা) জংশনে আগমন করিয়া নিজের ডাক্তারখানার মাধ্যমে ঐ পাঁচন বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জন করিতে লাগিলেন। তিনি ঐ অঞ্চলের দীন দরিদ্র ও আর্তদের প্রকৃত দরদী বন্ধু ছিলেন। কোন জ্বরাক্রান্ত রোগী চিকিৎসার জন্য তাঁহার দ্বারস্থ হইলে তিনি অতীব মধুর বচনে সচরাচর বলিতেন, ''যখন সব ডাক্তার ফেল হয়ে যাবে, তখন আমায় ডাকবি কারণ আমি তো পাশ করা ডাক্তার নই।'' ভূতনাথবাবু যে রোগীকে নিরাময় করিবার ভার গ্রহণ করিতেন তাহাকে নিছক ঔষধ দিয়াই বিরত থাকিতেন না, পরন্তু তাহার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া নিজে তাহাকে ঔষধ পথ্যাদি সেবন করাইতেন এবং রোগী অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ না করিলে তাহার শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিতেন না। ঔষধ বিক্রয় ব্যতীত রোগীদের ডাকেও তাঁহার আশাতীত অর্থাগম হইত। ভূতনাথবাবুর গৃহস্থিত একটি বিশিষ্ট কক্ষে মাটির নিম্নে একটি লৌহ সিন্দুক প্রোথিত ছিল, যাহার আবরণ ডালাটি ঊর্দ্ধোমুখী থাকিত। ভূতনাথবাবু মধ্যে মধ্যে সেই কক্ষে গমন করিয়া সংগৃহীত অর্থ পকেটাভ্যন্তর হইতে ঐ সিন্দুকে ফেলিয়া দিতেন। দিনান্তে ধামীতে সঞ্চিত ঔষধ বিক্রয়ের অর্থও উক্ত সিন্দুকে নিক্ষেপ করিতেন। তিনি সততঃই এত ব্যস্ত ও ব্যাপৃত থাকিতেন যে তাঁহার অর্জিত অর্থ গণনার অবকাশ থাকিত না। অসৎ ব্যক্তিগণ তাঁহার এই অবস্থার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়া অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার উপর দিয়া অচল টাকার সদ্গতি করিয়া লইত। কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র ক্ষোভ পোষণ না করিয়া সেই অচল মুদ্রাগুলি পুনরায় ব্যবহার রোধের উদ্দেশ্যে বাটীর নিকটস্থ পুষ্করিণীতে ছেলেদের দ্বারা নিক্ষেপ করাইবার প্রতিযোগিতায় উৎসাহ দান করিতেন।

ভূতনাথবাবুর গৃহের অদূরে নিজ উদ্যানে একটি ক্ষুদ্র সাধনাশ্রম ছিল এবং সেই আশ্রমে বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম ঘটিত। দিনের কর্ম সমাপনান্তে ঐ আশ্রমে অধিক রাত্রি পর্যন্ত সমবেত সাধু-সন্তদের সহিত শাস্ত্রালোচনা ও যোগাভ্যাস ছিল ভূতনাথবাবুর নিত্য কর্ম। আশ্রমস্থিত সাধু সন্ন্যাসীদের আহারাদির ব্যবস্থার জন্য প্রতিদিনই একধামী ময়দা ও একটি আড়াই সের ওজনের নূতন শ্রীঘৃতের টিন ক্রয়ের জন্য ভূতনাথবাবুর অর্থ বরাদ্দ ছিল। এই ঘৃত তিনি বোলপুর হইতে আনাইবার ব্যবস্থা করিতেন। সাধুগণ উক্ত ঘৃত ও ময়দা সহযোগে তাঁহাদের সম্মুখস্থ প্রজ্জ্বলিত ধুনিতে স্বহস্তে চাপাটি ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিতে করিতে শাস্ত্রালোচনা করিতেন। ভূতনাথবাবুর পৌত্র ডাক্তার শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এখনো ঐস্থানে চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন এবং পিতামহের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু কিছু অবহিত আছেন। যাহা হউক, ভূতনাথবাবুর আলয়ে অতীব সমাদরে মাণিকলালের দিন অতিবাহিত হইতেছিল। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, বৈকালে এবং রাত্রিকালে সুনিয়মিতভাবে ভোজ্যবস্তুর উপকরণাদির প্রাচুর্য্যে মাণিকলাল স্বভাবতঃই সঙ্কুচিত ও বিব্রত বোধ করিতে লাগিলেন। মাণিকলালের জন্য নিত্য তাঁহার আহারের সামগ্রী সকল এককালীন এক নির্জন কক্ষে পরিবেশন করিবার আদেশ ছিল এবং গৃহের ঐ কর্মের সংশ্লিষ্ট সকলে সেই অনুযায়ীই অভ্যস্ত হইলেন। ভূতনাথবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র নলিনের উপর মাণিকলালের সর্ব সময়ের জন্য দেখাশোনার ও

রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভার অর্পিত হইল। দিবাভাগে যখন ভূতনাথবাবু তাঁহার রোগীদের লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, তখন মাণিকলাল তাঁহার অধিকাংশ অবসর সময় সন্নিকটস্থ কানু জংশনেই অতিবাহিত করিতেন এবং সেই কারণে স্টেশনমাস্টার ও অন্যান্য কর্মচারীদের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। রাত্রিকালে ভূতনাথবাবু মাণিকলালকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার উদ্যানস্থিত আশ্রমের সাধুদের সমীপে উপনীত হইতেন এবং শাস্ত্রীয় আলোচনা ও শাস্ত্রীয় বাক্য শ্রবণে তাঁহারা উভয়ে তন্ময় হইয়া পড়িতেন। এই আলোচনার অবসরে কখনও কখনও মাণিকলালের প্রতি স্নেহ-পরবশ হইয়া সাধুরা তাঁহাদের তৈয়ারী চাপাটি মাণিকলালকে আহারের জন্য দিতেন।

এইভাবে কয়েক ঘন্টা অতিবাহিত হইলে রাত্রি প্রায় দুই-আড়াই ঘটিকায় নিদ্রা যাইবার জন্য মাণিকলালের প্রতি সাধুদের আদেশ হইত এবং মাণিকলাল নত মস্তকে তাহা পালন করিতেন। *...ক্রমশঃ*

—শ্রীমাণিকলাল দত্তের শিষ্য,

শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়

জ্ঞানগঞ্জের যোগ প্রসঙ্গে

শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্তের বিশেষ অনুরোধে ডঃ গোপীনাথ কবিরাজজীর ১৮টি পত্রের সাধন মার্গের নিগূঢ় তত্ত্ব ও সাধন প্রণালীর উপর শ্রীশ্রীমায়ের যোগ-ব্যাখ্যা —

ডঃ গোপীনাথ কবিরাজের পত্রাবলী প্রসঙ্গে :—

মরমী সাধক ডঃ গোপীনাথ কবিরাজজীর গুরুভ্রাতা শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয়কে জ্ঞানগঞ্জের সাধন মার্গের ক্রিয়াযোগের যে সকল নিগুঢ় তত্ত্ব, তথ্য এবং সাধন প্রণালীর বিষয় চিঠিতে উল্লেখ করেছেন তারই কয়েকটি প্রশ্ন :—

৮। (পত্র নং ৯) —(প্রথম ভাগ) .....নামিবার ধারা ও উঠিবার ধারা কি? কারণ সৃষ্টির ধারা না বুঝিলে সংহার বা ফিরিবার ধারা বুঝা যায় না।

.....জগতে যে সকল মনুষ্য আছে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবার যোগ্য —সাধক, যোগী ও সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষ জন্মে এবং মরে; তারপর তাহাদের কিছু অবশিষ্ট থাকে না। তাহাদের পুনর্জন্ম নাই(?)। বাবা মৃত্যু কথাটি ব্যবহার করেন না। তিনি বলেন মৃত্যু বলিয়া কোন পদার্থ নাই(?)। এই সকল নর ৫০-শের পরবর্তী যে মহামায়ারূপ অপার আছে তাহাতে বোধহীন হইয়া লীন হইয়া যায়। মোহমায়াতে তাহাদের এমন কিছু সত্তা বাকী থাকে না যাহা ফিরিতে পারে। তাহাদের সমস্ত সত্তাই ভাঙ্গিয়া মিলিয়া যায়। যাহার ফিরিবার কথা সেই যদি না থাকিল তাহা হইলে ফিরিবে কে? এরা একবার জন্মায়, একবার মৃত্যু বরণ করে। তারপর সব শেষ। কিন্তু যাহারা সাধক তাহারা মোহ-মায়ার 'অপার' ভেদ করিয়াও বর্তমান থাকে। সাধারণ নর জড় ভাবাপন্ন, কিন্তু সাধকের চৈতন্যাংশের বিকাশ থাকে; উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদ।

.....সাধক ১০৪-এর উপর উঠিতে পারে না। তাহার পঞ্চমে স্থিতি।

যোগী ভিন্ন ১০৪ ভেদ করিয়া উঠিবার সাধ্য কাহারও নাই।

....সাধারণ নর যোগনিদ্রা হইতে আসে, মোহ-মায়াতে বিলীন হয়। সাধক ভাব হইতে আসে গুণে স্থিতিলাভ করে। ইহাই চিদাকাশে অবস্থান। যোগী অভাব হইতে আসে, স্বভাবে স্থিতিলাভ করে। যোগী ভিন্ন ১০৫ হইতে ১০৯ পর্য্যন্ত ভূমিলাভ কাহারও হয় না। (—এই বিষয়ে শ্রীশ্রীমায়ের মত)

উত্তর — পত্র ৯-এর প্রথম ভাগ — সৃষ্টির ধারা বলিতে গেলে প্রথমেই বলিতে হয় বিশ্বপ্রকৃতির জড় ও চেতন পদার্থের বিভিন্ন বিষয় ছাড়াও প্রধান দুই শ্রেণীর সত্তাত্মা দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) ঈশ্বরকোটী (যাঁহারা আদিসৃষ্ট অযোনি সম্ভবা শ্রেণীয়) (২) জীবকোটী (যাঁহারা জগতে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন পর্য্যায়ে জীবসত্তা বলিয়া পরিগণিত); তন্মধ্যে এই জগতের মনুষ্যলোকে যে সকল মনুষ্য আছে তাহাদের তিন শ্রেনীতে বিভক্ত করা হইয়াছে; যেমন সাধক, যোগী ও সাধারণ মানুষ। সাধকের ক্ষেত্রেও বহু শ্রেণী বিভাগ আছে, যোগীরও তাই এবং সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও বহুধা শ্রেণীবিভাগ আছে। গীতায় শ্রীভগবান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র মানুষের এই চারি প্রকার শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। কর্ম ও কর্মফলের নিয়ম অনুযায়ী সকল মানুষের গতিলাভ হয়। সকল জীবের সত্তাই সৃষ্টির নিয়মের ক্রমবিবর্তনের ধারাকে অনুসরণ করিয়া চলে। কর্মের ফলের ধারা অনুযায়ী সাধারণ মানুষ ও সাধক যোগীগণ জন্মমৃত্যুর কালচক্রে পরিভ্রমণ করিয়া সত্তার বিবর্তনের গতিতে অগ্রসর হয় এবং পিছাইয়াও যায়। যাহারা পিছাইয়া পড়ে এবং যাহারা অগ্রসর হইতে থাকেন সিদ্ধ-মহাত্মাগণেরা ইহাদের সর্বদাই উন্নয়নের পথে পরিচালিত করিয়া থাকেন। অতি সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে এই জন্ম-মরণ কালচক্রে আসা-যাওয়ার ব্যাপারটি, মানুষেরই অজ্ঞানতার

জন্যে সংসারের মোহ-মায়াদির আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া বিষ্ণুনাভির কালগর্ভে অতীব অন্ধকারাচ্ছন্ন মোহগর্তে সেই সকল আত্ম সত্তারা পতিত হইয়া বোধহীন জড় অবস্থায় পরিণত হইয়া ধ্বংস হয়। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, আত্মা অবিনশ্বর; তাই এক্ষেত্রে বলা যায় যে সাধারণের ব্যক্তিসত্তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় মাত্র, আত্মারূপী ব্রহ্মাণুর বিনাশ হয় না। বহু যুগযুগান্ত পরে কখনো যদি পরাসম্বিৎময় চিৎশক্তির প্রবাহ বিষ্ণুনাভিতে সেই স্থলে প্রবেশ করে তখন ঐ সকল ব্রহ্মাণুগুলি পুনঃ সৃষ্টি অভিমুখী হইয়া পুনঃ বিভিন্ন পর্য্যায়ের জড় ও চেতন প্রজাতি শ্রেণীয়র মধ্যে আবিষ্ট হয়। ইহাদের পুনর্জন্ম নাই কারণ ইহারা ধ্বংসকালে black hole-এ প্রবিষ্ট হইবার সময়েই স্ব-স্বরূপকে হারাইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে 'মৃত্যু' অর্থে 'ক্ষয়' বুঝায়। স্থূল দেহাবসানে সাধকগণ আপন শুদ্ধভাবের প্রভাবে প্রবল সংবেগে বিষ্ণুনাভিরূপ কালসূর্য্যের ওপারে ঊর্দ্ধলোকে যাইয়া গতিপ্রাপ্ত হয় এবং লোকানুযায়ী সূক্ষ্মদেহ প্রাপ্ত হয়। তাই বলা হইয়াছে যে সাধকের সত্তা মোহ-মায়ার 'অপার' ভেদ করিয়াও বর্তমান থাকে। সাধকেরা পথভ্রষ্ট হইলে পরে সদ্‌গুরুর উপদেশে যোগাবলম্বন পূর্বক মোহমায়ারূপ 'অপার' ভেদ করিতে সক্ষম হন। সাধকের ক্ষেত্রে চৈতন্যাংশের বিকাশ থাকে বলিয়া উহা সম্ভব হয়, যেখানে সাধারণ জড়ভাবাপন্ন নরের ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব হয় না।

সাধক ১০৪-এর উপর উঠিতে পারে না অর্থে বোধ, জ্ঞান, ভাব এবং গুণের ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না। সাধককে কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত করিতে হয় স্বচেষ্টায় কোনও উপায়ে মন্ত্র অবলম্বন করিয়া। কিন্তু যোগীকে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগাইতে হয় না কারণ যোগী আপন সদ্‌গুরুর নিকট ব্রহ্মবিদ্যারূপ যোগমার্গ প্রাপ্ত হইয়া জাগ্রত শক্তিই প্রাপ্ত হন। তাই যোগীর স্বকর্ম আছে, আত্মকর্ম আছে আর সাধকের স্বকর্ম বা আত্মকর্ম নাই। স্বকর্ম আছে বলিয়াই যোগসাধনবলে যোগী বহুধারূপ ক্রিয়াশক্তির অধিকারী হন আর সাধকের ক্ষেত্রে সেসব থাকে না। তাই সাধক আপন জন্মার্জিত সংস্কার এবং সংবেগপূর্ণ মনন চিন্তনের সহায় একাগ্র অধ্যাবসায়ের ফলে পঞ্চম, অর্থে, বিশুদ্ধ চক্রের চেতনা পর্য্যন্ত স্থিতিলাভ করিতে সক্ষম হন মাত্র।

সাধারণ নর যোগনিদ্রা অর্থে সুষুপ্তি অবস্থার জড়বোধ হইতে আসে বলিয়া সত্তায় কুণ্ডলিনী শক্তি জড় স্বভাব সম্পন্ন থাকে তাই তাহাদের সত্তা মোহ-মায়াতে বিলীন হয়। সাধক ভাব হইতে আসেন বলিয়া গুণে স্থিতিপ্রাপ্ত হন (অর্থাৎ, অন্তঃস্থিত ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নায় ক্রমানুযায়ী স্থিতিলাভ করেন) — সুষুম্নায় অবস্থানই চিদাকাশে অবস্থান। যোগী অভাব হইতে অর্থাৎ বিশুদ্ধ জড় অবস্থা যাহা ব্রহ্মভাব, সেই অবস্থা হইতে আসেন এবং আত্মায় বা স্বভাবে স্থিতিলাভ করিতে সক্ষম হন। যোগীর সত্তাই একমাত্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ, শিবত্বলাভ)। এইগুলিই তো সমস্ত 'উঠিবার ধারা'। (ইহার মধ্যে আরও অনেক প্রকার ব্যাপার আছে যেগুলি এইস্থলে আলোচনা হইল না।)

—যোগ প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

পুরাণ কথা

নরপতি ক্ষুপ

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

পুরাকালে 'ক্ষুপ' নরপতি ব্রহ্মার ক্ষুত বা হাঁচি হইতে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি অসুর বধার্থ ইন্দ্র প্রেরিত হইয়া, দেবরাজ ইন্দ্র হইতে বজ্র অস্ত্র প্রাপ্ত হন। তিনি স্বেচ্ছাপূর্বক নরদেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীর অধীশ্বর হন। একবার ক্ষুপ ও তাঁহার বন্ধু দধীচ মুনির মধ্যে 'ব্রাহ্মণ বড় না রাজা বড়' এই বিষয় লইয়া খুব তর্ক-বিতর্ক হয়। সেই ঘোরতর তর্ক-বিতর্কের সময় দধীচ মুনি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুপ নরপতির মস্তকে আঘাত করেন এবং সেই কারণে ক্ষুপ দধীচকে বজ্রদ্বারা ছিন্ন করেন। সেই ছিন্নভিন্ন দেহ লইয়া দধীচ মুনি তখন শুক্রাচার্য্যের নিকট গিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রসিদ্ধ ছিলেন। শুক্রাচার্য্য তখন দধীচকে সিদ্ধমন্ত্রবলে জীবিত করেন ও মহাদেবের আরাধনা করিতে উপদেশ দেন। তদনুসারে দধীচ মহাদেবের আরাধনা করিয়া বজ্রাস্থিত্ব, অবধ্যত্ব ও অদীনত্ব লাভ করেন এবং ক্ষুপ নরপতির নিকট গিয়া তাহার মস্তকে পদাঘাত করেন। তখন ক্ষুপ এই অপমানের প্রতিকারার্থ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে ভগবান বিষ্ণু তখন ক্ষুপের জন্য কিছুই করিতে পারিলেন না। অবশেষে ক্ষুপ তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়া দধীচের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। — এই কাহিনী থেকে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে সত্ত্বোর্জিত ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ রজোগুণসম্পন্ন রাজা হইতে শ্রেষ্ঠ ও মহান।

মহাভারতে আছে, একবার ব্রহ্মা যজ্ঞ করিতে বাসনা

করিয়াছিলেন কিন্তু আপনার তুল্য পুরোহিত প্রাপ্ত না হইয়া আপন মস্তকে গর্ভধারণ করেন। সেই মস্তকোস্থিত গর্ভ হইতে প্রজাপতি ক্ষুপের জন্ম হয়। ক্ষুপ মহাপ্রজাপতি ব্রহ্মার যজ্ঞে পৌরহিত্য করিয়াছিলেন। পরে মহাদেব তাহাকে সমগ্র লোকের অধিপতি করেন।

সত্যযুগে বৈবস্বত মনু রাজা হইয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র প্রসন্ধি। প্রসন্ধির পুত্র ক্ষুপ, ক্ষুপের পুত্র ইক্ষ্বাকু। ক্ষুপ তাঁহার পূর্বপুরুষ হইতে, প্রজাপালন করিবার জন্যে যে অসি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তিনি সেই অসি ইক্ষ্বাকুকে প্রদান করেন।

(সহায়ক গ্রন্থ— মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ)

যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা

প্রসঙ্গ (৫১)

আমার গুরুমহারাজ লাহিড়ী বাবার (শ্রীসরোজ কুমার লাহিড়ী) বাল্যবন্ধু বাবলাদা (শ্রীতিমির বরণ ভট্টাচার্য্য)

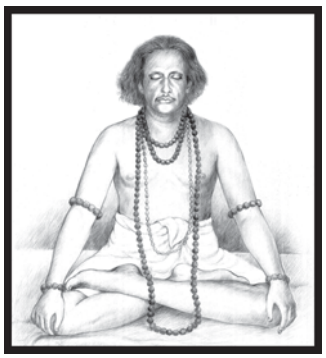

শ্রীশ্রীবাবার শুধু বন্ধুই ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন হরিহর-আত্মার মত সম্বন্ধে সংযুক্ত। গুরুমহারাজের মাতৃদেবী বাবলাদাকে সন্তান স্নেহে নিজের কোলে স্থান দিতেন কারণ বাবলাদার নিজের মা অনেক শৈশবেই দেহরক্ষা করেন। এই বাবলাদার বংশের আরও একটু পরিচয় দিই। ওনার বাবা স্বনামধন্য ঁশ্রীকানাইলাল ভট্টাচার্য্য বামফ্রন্টের সময় সৎ এবং দক্ষ শিল্পমন্ত্রী ছিলেন। তিনি বরাবর ফরোয়ার্ড ব্লক-এর হয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং মন্ত্রীত্ব করেছেন। ওনার নামানুসারে হাওড়ায় রামরাজাতলায় 'কানাই ভট্টাচার্য্য কলেজ' হয়েছে। বাবলাদারা সপরিবারে গুরুমহারাজের বাড়ী সময় পেলেই চলে যেতেন। ওনাদের জীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে গুরুমহারাজের সঙ্গ করার সময়। এখানে বেশ কয়েকটি ঘটনা বাবলাদা ও বাবলাদার সহধর্মিনী বৌদির নিজ মুখ থেকে আমরা শুনব।

—''আমার (বাবলাদার) পিতৃদেব একবার এক কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সালটা সম্ভবতঃ ইং ১৯৭৩, ডিসেম্বর ১০/১২ তারিখ নাগাদ হবে। ওনার পেটের কোলাইটিসের আলসারে দীর্ঘদিন যন্ত্রণা পাচ্ছিলেন। এই রোগে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ ও ব্যথা হয়। উপরোক্ত দিনটিতে বাবা এত অসুস্থ হয়ে পড়েন যে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হতে আরম্ভ করলে পরে তখন বাবা একদম মৃতপ্রায় হয়ে যান। তখন সরোজদা (শ্রীশ্রীবাবা) প্রায় জোর করে আমাকে গুরুমহারাজ শ্রীশ্রীনিতাইবাবার কাছে নিয়ে যান এবং আমি তখন নিতাইবাবার পায়ের কাছে বসে কাঁদতে থাকি কিন্তু মুখে কিছুই বলতে পারছিলাম না। তখন সরোজদা আমায় বলেন, ''আরে, কাঁদলে কি হবে, বাবাকে তোমার বাবার ব্যাপারটা খুলে বলো।'' তখন নিতাই বাবা নিজে জানতে চাইলেন। বলা হলে তারপর নিতাইবাবা হঠাৎ বলে উঠলেন, ''দেখো, তোমার বাবার প্রদীপেতে যদি বিন্দুমাত্রও তেল থাকে, তাহলে উনি সুস্থ হয়ে বেঁচে ফিরবেন। তারপরেই আমরা দেখলাম যে বাবা হঠাৎ পদ্মাসনে স্থির হয়ে বসলেন এবং তারপর মুহূর্তেই ওনার শরীরটা প্রচণ্ডভাবে থর থর করে কাঁপতে লাগলো। এই দেখে আমরা বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। তারপর, কিছুক্ষণ বাদে বাবা (শ্রীনিতাইবাবা) সম্পূর্ণ স্থির হয়ে গেলেন এবং চোখ চেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন — ''তোদের ডাক্তার ২৩শে ডিসেম্বর আসবেন এবং বলবেন যে ঠিক পরের দিন অর্থাৎ ২৪শে ডিসেম্বর বাবা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবেন।'' —এতো ভগবান গুরুর কথা; সুতরাং আমি এবং সরোজদা নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী চলে এলাম। ঠিক ২৩শে ডিসেম্বর, বাবাকে যে ডাক্তার দেখতেন অর্থাৎ ডাঃ সুখেন্দু বিশ্বাস, তিনি এসে বললেন —''আমি যা দেখছি তাতে তিনি আগামীকাল সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবেন।'' বাবা তারপর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন।''

মহাত্মারা এইভাবেই মানুষকে কৃপা করেন। আয়ু থাকলে জীবনে তুফান উঠলেও ভগবান গুরুগণ প্রারব্ধের ভোগকে অতিক্রম করার জন্য মানুষকে সহায়তা করেন। মহাত্মনের সঙ্গে সংযোগ লাভ করা জীবনের এক মহিমময় মুহূর্ত বিশেষ। সৎসঙ্গে জীবের অশেষ কল্যাণ সাধন হয়।

প্রসঙ্গ (৫২)

''প্রদীপ, আমি যে সুস্থ হয়ে তোমার সাথে কথা বলছি, কিন্তু তুমি তো জান না যে আমার ব্রেন-এ খুব একটা বড়সড় অপারেশন্ হয়ে গেছে।'' এও সরোজদার এক বিরাট মহিমা। এখনও লোকে সাউথ-ইণ্ডিয়ায় ব্রেন-অপারেশন্ করতে গেলে

প্রবল চিন্তার মধ্যে থাকে রুগী বাঁচবে কি না? আর তখন আমার অপারেশন্ হয়েছিল হাওড়ার People's Nursing Home-এতে; আমার ব্রেন-অপারেশন্-এর জন্যে আমি নিজে খুব ভীত ছিলাম যে আর বেঁচে ফিরব কি না? সরোজদা বলেছিলেন যে, ''আমি তো আছি। আপনারা কোনও চিন্তা করবেন না।'' আমার ব্রেন-অপারেশন্-এর পর অচেতন অবস্থায় আমি বেড-এ তিনদিন শুয়ে ছিলাম। আর সরোজদা ওই টানা তিন দিন পা থেকে মাথা অবধি চাদর দিয়ে ঢাকা দিয়ে শুয়েছিলেন; ঐ তিনদিন কোনরূপ জলপান বা আহার গ্রহণ করেননি এবং মূত্র ও মলত্যাগ অবধি সব বন্ধ ছিল। সেই সময় সরোজদা নিজ সন্তান এবং স্ত্রীকে আমার Nursing Home-এতে রেখে দিয়েছিলেন যাতে কখন কি দরকার হয়।'' —স্মৃতি রোমন্থন করে বাবলাদা অতি সহজভাবে এই কাহিনীটি আমাকে বলেন।

প্রসঙ্গ (৫৩)

বাবলাদা বলে চলেছেন —''বেশ কিছু বছর আগের ঘটনা, আমি আমার ছোট মেয়েকে নিয়ে দিল্লীতে যাবো মেয়ের একটা চাকরীর পরীক্ষায় বসার জন্য। আমার ছোট মেয়ে Finance and Marketing নিয়ে MBA পাশ করেছিল। সুতরাং আমরা দাদার কাছে অনুমতি চাইতে গেলাম কিন্তু উনি মত দিলেন না এবং বললেন, ''যে কোন কারণেই হোক তোমার মেয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে না।'' তবুও সরোজদার কথা না মেনে আমরা রাজধানী এক্সপ্রেসেতে চড়ে বসলাম এই ভেবে যে দাদা (সরোজদা) বলে বলুন, উনি তো আমাদের সঙ্গেই আছেন। কিন্তু দিল্লীতে পা দেওয়ার আগেই আমরা দেখলাম যে, আমাদের যে আসল ব্যাগটা ছিল, যে ব্যাগটা আমরা বিশেষ জায়গায় রেখেছিলাম, যার মধ্যে মেয়ের Call Letter, আমাদের Identity proof, সমগ্র টাকা এবং আরও কিছু দরকারি জিনিসপত্র ছিল সেটি চুরি হয়ে গিয়েছে। যাই হোক, আমরা সম্পূর্ণ কপর্দকহীন অবস্থায় দিল্লীতে পৌঁছলাম এবং সেখানে settled আমাদের এক মাসতুতো ভাইয়ের বাড়ীতে বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিলাম; মেয়ের তো পরীক্ষা দেওয়া হলই না বরং আমরা সবাই মানসিক দিক দিয়ে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আমরা নিজেদের ধিক্কার দিতে লাগলাম এই ভেবে যে দাদার নিষেধ সত্ত্বেও আমরা ওঁনার কথার গুরুত্ব না দিয়ে রাজধানীতে (ট্রেনে) চড়ে ছিলাম।''—

সিদ্ধ মহাত্মাগণের মুখের বচন কখনো মিথ্যা হয় না। তাই তাঁরা যখন কাউকে কিছু বলেন তার কল্যাণের জন্যে, মঙ্গলের জন্যেই বলেন। সিদ্ধ মহাত্মার কথা বিশ্বাস করে পালন করা উচিত।

প্রসঙ্গ (৫৪)

আরও একবার ঠিক এই রকম ঘটনা ঘটেছিল। সেবারেও আমাদের মেয়ের চাকরীর পরীক্ষার সিট্ পড়েছিল হায়দ্রাবাদে কিন্তু এবারে ভুল না করে আমরা দাদার (সরোজদা অর্থাৎ আমাদের 'শ্রীশ্রীবাবা') কাছে অনুমতি চাইতে গেলে এবারেও উনি বারণ করলেন। সুতরাং আমাদের ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও গেলাম না। ঠিক দিন তিনেক বাদে কাগজে দেখলাম যে হায়দ্রাবাদে হঠাৎ riot লেগেছে এবং মেয়ের পরীক্ষার স্থলে গুলি চলেছে; বেশ কিছু মানুষজন মারাও গিয়েছে, চারিদিকে আগুন জ্বলছে। সম্ভবতঃ পরীক্ষাটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং দাদার কথা শোনার জন্যে এ যাত্রায় আমরা বেঁচে গেলাম।''

সিদ্ধ মহাত্মাগণের উপদেশ গ্রহণ করলে জীবনে শান্তি ও অনন্ত মঙ্গল হয়। জয় বাবাজী মহারাজ।। *...ক্রমশঃ*

—পিতৃচরণাশ্রিত শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, শিবপুর, হাওড়া

কৃষ্ণ কথা

ত্রিপুর দৈত্যের কাহিনী

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

একবার শিব, ''আমিই জগতের সংহারকর্তা'' এইরূপ মনে করিয়া অহঙ্কারের সহিত ত্রিপুর দৈত্যকে বিনাশ করিতে উদ্যত হন। কিন্তু দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়াও ভগবান শঙ্কর তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। বরঞ্চ তুমুল যুদ্ধের সময়ে ত্রিপুর দৈত্য রথসহ শঙ্করকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া সংজ্ঞাহীন করিয়া ফেলিলেন। সেই অবস্থায় পতিত রহিয়া তখন শঙ্কর শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। শঙ্করের স্তবে তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণ শিববাহন বৃষরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে বহন করিয়া তাঁহার হস্তে দিব্য শূল অস্ত্র প্রদান করিলেন। সেই বৃষভ স্কন্ধে আরোহিত অবস্থায় দিব্য শূলাস্ত্র দ্বারা ভগবান শিব তখন ত্রিপুর দৈত্যকে বধ করিতে সক্ষম হইলেন।

(ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ হইতে সংগৃহীত)

কলি যুগে ভক্তি দেবী শ্রেষ্ঠ

(২)

দেবর্ষি নারদ পৃথিবী পরিভ্রমণ কালে এক বিষণ্ণ যুবতী স্ত্রী ও তার পাশে দুজন অচেতন বৃদ্ধ পুরুষকে দেখেন। তাঁদের ঘিরে শত শত নারী দাঁড়িয়েছিলেন। তাই দেখে তিনি প্রশ্ন করায়....(*পূর্ব প্রকাশিতের পর...*)

যুবতীটি বলেন - 'আমার নাম ভক্তি, এই পুরুষ দুজন আমার দুই ছেলে জ্ঞান ও বৈরাগ্য। কালের গতিতে এদের এমন জর্জরিত অবস্থা। এইসব দেবীগণ গঙ্গা আদি নদীবৃন্দ আমার সেবা করার জন্যই এসেছেন। হে তপোধন! দয়া করে আমার কাহিনী শুনুন। আমি দ্রাবিড় দেশে উৎপন্ন হয়ে কর্ণাটকে বড় হয়েছি, মহারাষ্ট্রের কোথাও কোথাও আমি সম্মানিত হলেও গুজরাটে এসে আমি অশক্ত হয়ে পড়ি। সেখানে ঘোর কলিকালের প্রভাবে পাষণ্ডগণ আমার সর্বাঙ্গ ভেঙে দিয়েছে। বহুকাল এই অবস্থায় থাকাতে আমার ছেলেরাও দুর্বল নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। এরপর বৃন্দাবনে পৌঁছে আমি পরম রূপবতী যুবতীতে পরিণত হয়েছি। আমি নিজে তরুণী, আর আমার পুত্র এরা দুজন বুড়ো কেন?'

নারদ বললেন — 'বৃন্দাবনে এসে পড়ার ফলে তুমি আবার নবীনা তরুণী হয়ে গেছ। ধন্য এই বৃন্দাবনধাম যেখানে ভক্তি সর্বদাই নৃত্য করছে। কিন্তু তোমার এই দুই ছেলের এখানে কোনও গুণগ্রাহী নেই, এই জন্য এদের বৃদ্ধাবস্থা দূর হচ্ছে না। এখানে এদের কিছু আত্মসুখ প্রাপ্তির ফলে যেন নিদ্রাচ্ছন্ন বলে মনে হচ্ছে।'

ভক্তি দেবী বললেন -'রাজা পরীক্ষিত এই পাপী কলিযুগকে থাকতে দিয়েছেন কেন?' নারদ বললেন - 'হে সাধ্বী! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেদিন এই মর্ত্যলোক ছেড়ে নিজের পরমধামে চলে গেলেন, সেইদিন থেকেই এই মর্ত্যে সব রকম সাধন ভজনে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী কলিযুগ প্রবেশ করেছে। দিগ্বিজয়ের সময় রাজা পরীক্ষিত কলিযুগকে এই কারণেই বধ করলেন না যে যোগ সাধন, তপস্যা বা সমাধি দ্বারা যে ফল লাভ দুঃসাধ্য, কলি যুগে সেই ফল অতি উত্তমরূপে কেবল মাত্র শ্রীহরির নাম কীর্তনের দ্বারাই লাভ করা যায়।' ভক্তি দেবী বললেন -'হে দেবর্ষি! আমার অতীব সৌভাগ্য যে আপনি এখানে এসেছেন। সংসারে সাধুর দর্শনই সমস্ত সিদ্ধিলাভের পরম কারণ।' নারদ বললেন -'হে সাধ্বী! সত্য, ত্রেতা আর দ্বাপর এই তিন যুগে জ্ঞান আর বৈরাগ্য ছিল মুক্তির সাধন, কিন্তু কলিযুগে তো কেবল ভক্তিই ব্রহ্ম সাযুজ্য দান করে। তুমি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের পরমা সুন্দরী প্রিয়া। শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে সেবা করার জন্য মুক্তিকে তোমার দাসী রূপে এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে তোমার পুত্র রূপে দান করেন। তুমি তোমার সাক্ষাৎ স্বরূপে বৈকুণ্ঠধামে ভক্তদের পোষণ কর, মর্ত্যলোকে তুমিতো ভক্তদের পোষণের জন্য কেবলমাত্র ছায়ারূপ ধারণ করে রয়েছ। সেই থেকে তুমি মুক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে সাথে নিয়ে পৃথিবীতে এসেছ এবং সত্য, দ্বাপর পর্যন্ত খুবই আনন্দে ছিলে। কলি যুগে তোমার দাসী মুক্তি ভণ্ডামীরূপ রোগে আক্রান্ত হয়ে শীর্ণ হতে লাগল, সেই জন্য তোমারই আদেশে অতি সত্বর বৈকুণ্ঠলোকে চলে গেছে। এই লোকেও তোমার স্মরণ মাত্রেই সে উপস্থিত হয় এবং আবার বৈকুণ্ঠধামে চলে যায়, কিন্তু এই জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে নিজ পুত্র বোধে নিজের কাছেই রেখেছ। তবুও কলিযুগে এদের উপেক্ষা হওয়ার দরুণ তোমার এই ছেলে দুটি উৎসাহ-হীন ও বৃদ্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু তুমি চিন্তা কোরোনা, আমি এদের নব জীবন লাভের উপায় চিন্তা করছি। যার হৃদয়ে প্রেমরূপিণী ভক্তি সততই বিরাজ করে সেই শুদ্ধ অন্তঃকরণ জীব স্বপ্নেও যমরাজকে দর্শন করে না। তপস্যা, বেদধ্যয়ন, জ্ঞান ও বৈদিক কর্মাদি কোনও সাধনেই ভগবান বশীভূত হন না, ইনি কেবল ভক্তিতেই বশীভূত হন গোপাঙ্গনারা এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পুরাকালে ভক্তকে তিরস্কার করার জন্য দুর্বাসা মুনিকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছিল।' ভক্তি বললেন -'হে নারদ মুনি! আপনি ধন্য। আমার উপরে আপনার নিশ্চলা প্রীতি রয়েছে। আমি সর্বক্ষণ আপনার হৃদয়ে থাকব, কখনও আপনাকে ছেড়ে যাব না। হে সাধু! আপনি অত্যন্ত কৃপালু। আপনি ক্ষণকাল মধ্যেই আমার সমস্ত দুঃখ দূর করে দিয়েছেন। কিন্তু আমার পুত্রদের অচেতনতা এখনও দূর হল না, শীঘ্রই আপনি এদের চেতনা ফিরিয়ে দিন, এদের জাগিয়ে দিন।'

সূত বললেন —ভক্তির এই কথা শুনে নারদের দয়া হল তিনি তাদের অঙ্গমর্দন করলেন, তাদের কানের কাছে মুখ নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, 'জ্ঞান ও বৈরাগ্য জেগে ওঠ।' আবার বেদ পাঠ, বেদান্ত পাঠ ও গীতা পাঠ করে তাদের

জাগালেন। কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণায় দুর্বল অবস্থায় তাদের আবার ঘুমোতে দেখে নারদের বড়ই চিন্তা হল এবং মনে মনে ভাবলেন 'এখন আমি কি করি।' হে শৌনক! এই রকম চিন্তা করতে করতে তিনি গোবিন্দকে স্মরণ করতে লাগলেন। এমন সময় দৈববাণী হল যে, 'হে মুনি! দুঃখ কোরোনা, এর জন্য তুমি একটি সৎকর্মের অনুষ্ঠান কর।'

নারদ তখন অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বদরিকা বনে এলেন, সেখানে তিনি সনকাদি মুনিশ্বরদের দর্শন পেলেন। নারদ বললেন, 'হে মহাত্মাগণ! দয়া করে আমাকে সেই সাধন শীঘ্রই বলুন। ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য — এদের সুখ কিভাবে লাভ হবে?' সনকাদি মুনিগণ বললেন, 'হে নারদ! শ্রীমদ্ভাগবতের শব্দ কানে গেলেই ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের মহাশক্তি লাভ হবে। শ্রীমদ্ভাগবতের ধ্বনিতে কলিযুগের সমস্ত দোষ নষ্ট হয়ে যাবে। তখন প্রেমরস প্রবাহিনী ভক্তি তার দুই ছেলে জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিটি গৃহে প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে ক্রীড়া করবেন।' নারদ বললেন -'শ্রীশুকদেব কথিত ভাগবত শাস্ত্রের জ্ঞান-যজ্ঞ আরম্ভ করব। এই যজ্ঞের উপযুক্ত স্থান, কতদিনে শোনাতে হয়, তার বিধি নিয়মাদি কি, তাও আমাকে বলুন।' সনকাদি কুমার বললেন - 'হে নারদ হরিদ্বারের কাছে আনন্দঘাট নামে গঙ্গার একটি ঘাট আছে। সেখানে অনেক ঋষিরা বাস করেন, দেবতা ও সিদ্ধগণও সেখানে যান। স্থান মাহাত্ম্যের ফলে কথায় অপূর্ব রসের উদয় হবে। ভক্তি দেবী ও তাঁর চোখের সামনে নির্বল ও জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে থাকা জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হবেন। এই ভাগবত কথা কানে গেলেই এই তিনজনে তারুণ্য প্রাপ্ত হবেন।'

সূত বললেন, ''এই কথা বলে সনকাদি কুমারগণ ও নারদের সাথে শ্রীভাগবত কথামৃত পান করার লোভে সেখান থেকে সত্বর গঙ্গা তটে উপস্থিত হলেন। তাঁরা যখন গঙ্গা তটে পৌঁছলেন তার মধ্যেই ভূলোক, দেবলোক ও ব্রহ্মলোক সর্বত্র এই সংবাদ রটে গেছে। ভাগবত কথা রসিক বিষ্ণু-ভক্তেরা যে যেখানে ছিলেন শ্রীমদ্ভাগবতামৃত পান করার জন্য সকলের আগে দৌড়ে দৌড়ে আসতে লাগলেন। ভৃগু, বশিষ্ঠ, চ্যবন, গৌতম, মেধাতিথি, দেবল, দেবরাত, পরশুরাম, বিশ্বামিত্র, শাকল, মার্কণ্ডেয়, দত্তাত্রেয়, পিপ্পলাদ, যোগেশ্বর ব্যাস, পরাশর, ছায়াশুক, জাজলি এবং জহ্নু আদি সব প্রধান প্রধান মুনিগণই আপনাপন পুত্র, শিষ্য ও সহধর্মিণীদের নিয়ে আনন্দের সাথে সেখানে এলেন। এছাড়া বেদ, বেদান্ত, মন্ত্র, তন্ত্র, সপ্তদশ পুরাণ এবং ছয় শাস্ত্র মূর্তিধারণ করে সেখানে উপস্থিত হলেন। গঙ্গা ইত্যাদি নদী, পুষ্করাদি সরোবর, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্র, দিকসমূহ দণ্ডকাদি অরণ্য, হিমালয়াদি পর্বত এবং দেব, গন্ধর্ব ও দানবাদি সকলেই সেই ভাগবত কথা শোনার জন্য এসে গেলেন। তখন কথা শোনাবার জন্য দীক্ষিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণপরায়ণ সনকাদি কুমারগণ নারদ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করলেন। সমস্ত শ্রোতারা তাঁদের বন্দনা করলেন। চারিদিকে জয় জয়কার, বাচিক নমস্কার শব্দ ও শঙ্খধ্বনি হতে লাগল আর আবীর-গুলাল, খৈ ফুল বর্ষণ হতে থাকল।'' সূত বললেন -''এইভাবে পূজা ও সম্মানাদি প্রদর্শন পর্ব শেষ হলে যখন সকলে একাগ্রচিত্ত হলেন তখন সনকাদি ঋষিগণ মহাত্মা নারদকে শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য বিশদভাবে শোনাতে লাগলেন। সনকাদি মুনিগণ বললেন -'আমরা এখন আপনাদের এই ভাগবত শাস্ত্রের মহিমা শোনাব। এই মহিমা শ্রবণমাত্রই মুক্তি করতলগতা হন। শ্রদ্ধার সাথে সপ্তাহ ধরে শ্রবণে পূর্ণ ফল লাভ হয়, শুকদেব একথা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।' সূত বললেন -''হে শৌনক! ভগবান তাঁর সমস্ত শক্তি ভাগবতের মধ্যে রেখে দিলেন, তিনি অন্তর্ধান করে এই ভাগবত সমুদ্রে প্রবেশ করে গেলেন। তাই এই ভাগবত ভগবানের সাক্ষাৎ শব্দময়ী মূর্তি। হে শৌনক! সনকাদি মুনিগণ যখন সপ্তাহ শ্রবণের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করছিলেন, তখন সভায় একটা বড় আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছিল। আমি সেই কাহিনী তোমাকে বলছি শোন। তরুণাবস্থা প্রাপ্ত তাঁর দুই ছেলেকে সাথে নিয়ে বিশুদ্ধ প্রেমরূপা ভক্তিদেবী বারবার - 'শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব' উচ্চারণ করতে করতে অকস্মাৎ সেখানে উপস্থিত হলেন। সমস্ত সভাসদেরা দেখলেন যে পরমা সুন্দরী ভক্তিরাণী তরুণাবস্থা প্রাপ্ত তাঁর দুইপুত্র জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে নিয়ে এলেন। ভক্তিদেবী তাঁর পুত্রদের সাথে অত্যন্ত বিনম্রভাবে সনৎ কুমারদের বললেন -'কলিযুগে আমরা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিলাম, আপনাদের কথামৃত সিঞ্চন আমাদের আবার পুষ্ট করেছে। মর্ত্যধামে এই ভাগবত পরম ব্রহ্মের সাক্ষাৎ বিগ্রহ'।''

-ঐঁ গুরুদেবায় বিদ্মহে চৈতন্য রূপায় ধীমহি

তন্নো গুরু প্রচোদয়াৎ-

—মাতৃচরণাশ্রিত শ্রীগৌর গোপাল ঘোষ

(সহায়ক গ্রন্থ— শ্রীমদ্‌ভাগবত)

— সমাপ্ত —

শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের পত্রাবলী

শ্রীঅমরেন্দ্র চন্দ্র শ্যামের গ্রন্থনায়, 'অখণ্ড মহাপীঠ' দ্বারা প্রকাশিত ভগবান শ্রীশ্রীকিশোরী মোহনের জীবনী গ্রন্থ 'বৃহৎ কিশোরী ভাগবত'-এর অন্তর্গত ভগবান কিশোরী মোহনের অমূল্য আধ্যাত্মিক উপদেশ সমৃদ্ধ পত্রাবলীর থেকে নিম্নলিখিত পত্রটি উদ্ধৃত করা হল।

পত্র নং (৯)

শিষ্যের প্রতি তত্ত্বোপদেশ —

২৫শে ফাল্গুন, ১৩৪২,
কাশীধাম

অনন্তশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং, স্বল্পশ্চ কালো বহুবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং, হংসো যথা ক্ষীরমিব্যম্বুমিশ্রম্।
পুরাণং ভারতং বেদাঃ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
পুত্রদারাদিসংসারে যোগাভ্যাসস্য বিঘ্নকৃৎ।।
ইদং জ্ঞানমিদং জ্ঞেয়ং যৎ সর্ব্বজ্ঞাতুমিচ্ছসি।
বিজ্ঞেয়োহক্ষরসম্মাত্রো জীবিতঞ্চাপি চঞ্চলম্।।
বিহায় সর্ব্বশাস্ত্রাণি যৎ সত্যং তদুপাস্যতাম্।।

উত্তরগীতা তৃতীয় অধ্যায়।

ইহার অর্থ ভগবান বলিলেন, শাস্ত্র অনন্ত, জ্ঞেয় বিষয়ও বহু, কাল অল্প, বিঘ্ন বহু। যাহা সারভূত তাহাই গ্রহণ করিয়া উপাসনা করা কর্তব্য; হংস যেমন জল মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে কেবল সারাংশ দুগ্ধই গ্রহণ করে। পুরাণ, মহাভারত, বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র পুত্রদারাদি সংসারে যোগাভ্যাসের বিঘ্নকারী। ইহা জ্ঞান, ইহা জ্ঞেয়, এইরূপে যাহা কিছু জানিতে ইচ্ছা কর, সহস্র বৎসর আয়ু হইলেও শাস্ত্রপারে গমন করিতে পারিবে না। পরমাত্মা অক্ষয় (নিত্য ও সৎমাত্র, কিন্তু জীবন চঞ্চল। অতএব সর্ব্বশাস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক যাহা সত্য তাহারই উপাসনা কর। এক্ষণে পরমাত্মা কিরূপ তাহা বলিতেছি। পরমাত্মা চৈতন্য স্বরূপ। তাঁহার চৈতন্যে তোমার দেহের অভ্যন্তরে ও জগতে চৈতন্যের অনুভূতি হইতেছে। ঐ চৈতন্য সর্বব্যাপক। চৈতন্যেরই অপর নাম চিৎ। এজন্য পরমাত্মাকে চিদ্রূপ বলে। সেই চৈতন্য অস্তিত্বশীল সত্য ও তাঁহার অস্তিত্ব লইয়াই জীবের ও জগতের অস্তিত্ব, এজন্য তাহাকে সৎ বলে। সেই চৈতন্য আনন্দময় এজন্য তাহাকে আনন্দ বলে। এই হেতু পরমাত্মার স্বরূপ সচ্চিদানন্দ কথিত হয়। এই সত্তা ও চৈতন্য সর্বজীবের অভ্যন্তরে অনুভূত হয়। জীব সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মোপলীন হইয়া অচেতন থাকিয়াও তাঁহার স্বরূপ হইতে আনন্দ ভোগ করে। আর শুদ্ধ, সাত্ত্বিক একাগ্রচিত্তে আত্মধ্যানকালে পরমাত্মার সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ অনুভব করে। সত্তা ও চৈতন্য যে প্রকারে জীব কর্ত্তৃক অনুভূত হয়, আনন্দ সে প্রকারে অনুভূত হয় না। দীপশিখার দগ্ধ করিবার ও আলোকদান করিবার উভয় প্রকার শক্তি আছে কিন্তু আলোক দ্বারা কেহ দগ্ধ হয় না, দাহিকা শক্তি দীপশিখার অন্তর্বর্তী আছে। সেইরূপ, সংসারী জীব যত প্রকার আনন্দ উপভোগ করেন, তৎ সমস্তই পরমাত্মার আনন্দময়ত্বের আভাস। সেই পরমাত্মা শক্তিযুক্ত, সেই শক্তিবলে তিনি বিভূতিবান। ইহাই তাঁহার ঈশ্বরতত্ত্ব। শক্তি যুক্ত হওয়ায় পরমাত্মা চৈতন্যরূপ হইলেও তাঁহাকে চেতন বলে। সেই শক্তির অপর নাম প্রকৃতি, মায়া ইত্যাদি। তাঁহার শক্তি এক হইলেও ত্রি-আকারে, সত্ত্ব, রজো ও তমোরূপে স্ফুরিতা হইয়া তাঁহার সাত্ত্বিকী শক্তি, রাজসিকী শক্তি ও তামসিক শক্তি থাকা উক্ত হয়। এই ত্রিশক্তি-ই তাঁহার বশীভূতা। শক্তি বা মায়া তাঁহার বশীভূতা বলিয়া তাঁহাকে মায়ী, মায়াধীশ ইত্যাদি বলে।

এই সাত্ত্বিকী শক্তি প্রকাশশীলা, রাজসিকী শক্তি বিক্ষেপশীলা ও তামসিকী শক্তি আবরণশীলা। এই সাত্ত্বিকী শক্তিকে আশ্রয় করিয়া তিনি জীবের পালনকর্ত্তা জীবের কল্যাণকারী, শ্রুতির বক্তা ও জীবের উদ্ধারকর্ত্তা হয়েন। এই জন্য এই সাত্ত্বিকী শক্তিকে তাঁহার পরা বা উৎকৃষ্টা শক্তি বলে।

শ্রুতিতে পরমাত্মা সগুণ ও নির্গুণ এই উভয়ভাবে উক্ত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার সৃষ্ট এই জীব-জগতে সগুণভাবে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া ইহার স্থিতির জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন এবং নির্গুণভাবে সচ্চিদানন্দরূপেও অবস্থিত আছেন। তাঁহার একাধারেই সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব। শ্রুতি বলিয়াছেন — 'পাদোহস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্য অমৃতংদিবি।' ইহার অর্থ — তাঁহার এক পাদ লইয়াই জগৎ ও জীবের স্থিতি। ইহাই তাঁহার সগুণত্ব এবং ত্রিপাদ গুণাতীত নির্গুণ।

শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ আছে। যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তিতে ভেদ আছে। অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি এক নহে। অগ্নির যেরূপ দাহিকা শক্তি আছে সেইরূপ প্রকাশ শক্তি আছে। শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ থাকিলেও শক্তির অস্তিত্ব শক্তিমান ব্যতীত কোথাও দৃষ্ট হয় না। শক্তির কার্য্য দেখিয়া এই বস্তুর এই শক্তি আছে এইরূপ কথিত হয়। এইরূপে শক্তি ও শক্তিমানে অভেদে একই বস্তু। কেবলমাত্র শক্তিকে বস্তু বলা

যায় না। এই বস্তুর এই শক্তি আছে এইরূপে কথিত হয়। এই বস্তুর এই শক্তি আছে এইরূপে শক্তির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। পরমাত্মাতে তাঁহার স্বরূপ চৈতন্য ও শক্তি একীভূত হইয়া অবস্থান করায় অভেদে এক বলিয়া উক্ত হয়।

...ক্রমশঃ

(*'বৃহৎ কিশোরী ভাগবত' গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত*)

গীতা ভাবনা

(৩৪)

রামকৃষ্ণের আলোচনায় গীতার কথা অনেক এসেছে বলে শ্রী'ম গীতার শ্লোক উদ্ধার করেছেন নানা প্রসঙ্গে। উৎসাহী ব্যক্তিরা সহজেই গীতার সেই সব শ্লোক দেখে নিতে পারেন। ঠাকুরের ভক্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক হরিশচন্দ্র সিংহমশাই 'গীতাতত্ত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থে রামকৃষ্ণোক্ত বিভিন্ন তত্ত্ব গীতায় কিভাবে আছে সেই আলোচনা করে উভয়ধারার তাৎপর্য বোঝাতে চেয়েছেন। তখন ব্রাহ্মদের মধ্যে ঈশ্বরের নিরাকারত্ব না সাকারত্ব এই নিয়ে বিতর্ক চলছিল প্রচণ্ডভাবে। সনাতনধর্ম পরমাত্মাকে 'অজ' বলে স্বীকার করেও অবতার তত্ত্বে বিশ্বাস করত। গীতায় চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন -''অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া (৪/৬)।। শ্লোকের অর্থ নিয়ে শ্রীধর স্বামী ও শঙ্করের মধ্যে মতভেদ থাকলেও এখানকার মূল কথা হল - ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে নিজের ইচ্ছাধীন করে তিনি আবির্ভূত হন। কর্মসকল তাঁর অধীন, তিনি কর্মের অধীন নন।

গীতায় জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতির উপদেশ থাকলেও তাদের মূল হিসাবে নিষ্কাম কর্মের উপদেশ পাওয়া যায় - ''কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'', ভগবান বলেছেন - যতদিন জীবন আছে ততদিন জীবকে কর্ম করে যেতে হবে। ঘোরা, কথাবলা, শ্বাস নেওয়া প্রভৃতি জীবনধারণের উপযোগী কর্মকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। প্রকৃতি তার নিজের শক্তিতে জীবকে দিয়ে কর্ম করিয়ে নেয়। কথামৃতের ১ম ভাগে এই কথাটাই পাওয়া যায় -''তবে কর্ম একেবারে ত্যাগ করার যো নাই। তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কর্ম করাবে। তা তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর। তাই বলেছে অনাসক্ত হয়ে কর্ম কর। অনাসক্ত হয়ে কর্ম কর, কিন্তু কর্মের ফল আকাঙ্ক্ষা করবে না।'' প্রথম ভাগেই পাই -''কর্ম চাই, তবে দর্শন হয়। কর্ম না করলে ভক্তিলাভ হয় না। ধ্যান, জপ এই সব কর্ম। তাঁর নাম গুণকীর্তনও কর্ম - আবার দান, যজ্ঞ এসবও কর্ম।'' কথামৃতের ৪র্থ ভাগে পাই -''কর্মযোগ বড় কঠিন, নিষ্কাম না করতে পারলে বন্ধনের কারণ হয়।'' গীতা নিষ্কাম কর্মযোগী হিসাবে জনক প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেছে।

কর্মযোগের প্রসঙ্গ ঠাকুরের কথায় অধিক এসেছে কারণ তাঁর সামনে শ্রোতারা ছিলেন সংসারী। জ্ঞান ও ভক্তিযোগের কথা তিনি বলেন নি এমন নয়। প্রথম ভাগে ভক্তিযোগকে যুগধর্ম বলেছেন। আবার ৩য় ভাগে কর্ম, জ্ঞান ভক্তি সবই তাঁকে পাওয়ার পথ বলেছেন। ভক্তির পথ সহজ পথ হলেও জ্ঞান বিচারের পথ হল কঠিনমার্গ। ''ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ সবই পথ, যে পথ দিয়েই যাও তাঁকে পাবে। ভক্তির পথ সহজ পথ। জ্ঞান বিচারের পথ কঠিন পথ।'' গীতাকার বলেন সমস্ত কর্ম গিয়ে জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয় - ''সঠং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে''। শঙ্কর প্রভৃতি জ্ঞানমার্গীরা জ্ঞানকেই গীতার আদর্শ হিসাবে ধরেছেন। অথচ যোগীরা ''জ্ঞানাং ধ্যানম্ বিশিষ্যতে'' এই গীতার বাণীতে জোর দিয়েছেন। চৈতন্যের পর বাংলার ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে অন্য সমস্ত পথকে অতিক্রম করে ভক্তিবাদ প্রাধান্য পায়। বস্তুত পক্ষে তাঁর পরবর্তী কোন সাধকই ভক্তিকে এবং নামগানকে আর উপেক্ষা করতে পারেন নি। ঠাকুর ও কথামৃতের ৩য় ভাগে জ্ঞানকে সদর-মহলের আর ভক্তিকে অন্দর-মহলের রাস্তা বলেছেন —''জ্ঞান সদর-মহল পর্যন্ত যেতে পারে। ভক্তি অন্দর-মহলে যায়।'' বাংলার ইতিহাসে চৈতন্যোত্তর পর্বে ভক্তির মূল্য থাকলেও তার চরম পরিণতি কিভাবে বিবেক বর্জিত চিৎকারকারীর দলে পরিণতি লাভ করেছে তা নিম্নবর্গের হিন্দুধারায় স্পষ্ট।

কর্মযোগকে বাংলার বিপ্লবীরা আবার নতুন মাত্রা দিয়েছেন। গীতা আর বেদ হাতে নিয়ে বিপ্লবীরা যে অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষা নিতেন তার কারণ হল এখানকার নিষ্কাম কর্মের প্রেরণা। বঙ্কিমচন্দ্র গীতার এই কর্মবাদদের প্রেরণায় চমৎকৃত হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৯ শতকের একজন খ্যাতনামা মনিষী। গীতায় সকাম ও নিষ্কাম কর্মের যে উপদেশ আছে তাকে দেশ হিতৈষণার দৃষ্টিতে বিচার করেছেন তিনি। বঙ্কিম রচনাবলীর ২য় খণ্ডে তিনি লিখেছেন সকাম কর্মে অভ্যস্ত না হইলে নিষ্কাম কর্ম সম্ভব না। তাঁর মতে দেশের মঙ্গলের জন্য যখন কেউ কাজ করে তখন তা নিষ্কাম কর্মের

ধারা, কিন্তু কেউ যদি নিজের জন্য মান সম্ভ্রম উন্নতি ইত্যাদির বাসনা নিয়ে স্বদেশের ধর্ম সাধনে তৎপর হয় তাহলে তা সকাম কর্ম। এই নিষ্কাম কর্মকে উপজীব্য করেই বঙ্কিমের অনুশীলন ধর্মের আত্মপ্রকাশ।

অধ্যাপক গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর 'গীতার কথা' নামক গ্রন্থের নিবেদনে লিখেছেন - একদিন এই দেশেই পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য যখন সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল তখন এই গীতাই স্বদেশ-আত্মার উদ্ধারে প্রেরণা যুগিয়েছে, দেশের নেতাকে পথ দেখিয়েছে, সঠিক পথে পরিচালনা করেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে, কোন ধর্মগ্রন্থের এরকম সার্বজনীন প্রভাব ও প্রয়োগ আজ পর্যন্ত দেখা যায় নি। বঙ্কিমে গীতার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনার সময় এই বিষয়ে বিস্তারে যাব। *...ক্রমশঃ*

— অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক কথা

(২)

সদ্‌গুরু মাহাত্ম্য—

শ্রীশ্রীমা: যিনি সদ্‌গুরু হন, তিনি অখণ্ড মণ্ডলের বিরাট মহাপুরুষের সন্ত-মণ্ডল ও দেবমণ্ডল দ্বারা নির্বাচিত হন। সদ্‌গুরু জগতে বিরল। যিনি সদ্‌গুরুরূপে অবতীর্ণ হন তিনি বিরাট শক্তি নিয়ে আসেন। ওপর থেকে দেখলে তাঁকে সাধারণ মানুষের মত মনে হলেও তাঁর স্বভাব, তাঁর গুণ, তাঁর কর্ম ইত্যাদি কিন্তু সাধারণ হয় না। সদ্‌গুরু, সদ্‌গুরু দ্বারা অভিষিক্ত হন। নিজের ইচ্ছায় গুরু হওয়া উচিত নয়। সদ্‌গুরু ভিন্ন কারো অধিকারই নেই কোন জীবকে ঊর্ধ্ব চেতনায় উত্তোলিত করার। সদ্‌গুরু দ্বারাই সকল জীব পরমার্থলাভ করতে পারে। তাই সদ্‌গুরু ভগবান স্বরূপ। প্রকৃত গুরু ছাড়া কারো কিছু হবার নাই। সদ্‌গুরুই একমাত্র ব্রাহ্মী দীক্ষাদানে সমর্থ। সদ্‌গুরু শক্তি তোমার মনের মধ্যে যে ময়লা আছে সেটিকে আগে ধৌত করে দেবেন। দীক্ষার মুহূর্ত হতেই অন্তরের দৃশ্য অনেক কিছুই তুমি দেখতে পারবে। প্রকৃত দীক্ষা হলে সেই মুহূর্তেই কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়। আর কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার অভ্যন্তরের ষড়রিপুও জাগ্রত হতে থাকবে। অনেক সাধক সেই ষড়রিপুর তাড়না সহ্য করতে না পেরে ধৈর্য্য হারিয়ে তখন সবচেয়ে আগে সদ্‌গুরুকেই দোষারোপ করে বলে যে, "দূর! এ সব করে কোন লাভ নেই বাবা! কিযে আপনি দিয়েছেন, কিছুই তো হচ্ছে না।" কয়েক বছরেই সব মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ঋষির মত যোগৈশ্বর্য্যশালী হতে চায়। এই রকম বিক্ষিপ্ত চিন্তা, মানসিক চঞ্চলতায় মনে হয়, কারণ, মলিন মায়ার আবরণ। মায়াতে যুক্ত হয়ে আছে তোমার সত্তা। সদ্‌গুরুর মায়িক শুদ্ধদেহ দেখে মনে হবে — ও কিছুই না। এই সময় অনেক সাধক সাধন পথ থেকে দূরে চলে যায়, সদ্‌গুরুর শক্তিতে অবিশ্বাস পোষণ করে, ভাবে — তাঁর ওপর ভরসা নেই; নির্ভরতা রাখা যায় না। এইভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে কিছুদিন এদিক-ওদিক ঘুরে আবার সেই শ্রীগুরুপদপ্রান্তে শান্ত ছেলের মত একদিন ফিরতেই হয় তাকে, কারণ, সত্তায় সদ্‌গুরুর চিন্ময় বীজ জ্বলছে। যখন কোন শিষ্য এসে বলে, "মা, তোমাকে আর বিশ্বাস করতে পারছিনা। কি রকম যেন বিশ্বাসটা পুরো হচ্ছে না। আমি পরীক্ষায় ফেল করে যাব।" — এবার সদ্‌গুরু খুশী হলেন কারণ তার মন খুলে মনের অবস্থা সদ্‌গুরুকে প্রকাশ করল। তখন বলি —"তুই ঠিক পথে আছিস। তুই বিশ্বাস করবি কি করে, তোর শ্বাসের গতি যে এখনো স্থির হয়নি। তুই তো একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব মাত্র। তোর চিন্তা করার ক্ষমতাই বা কতটুকু? তোর ভিতরে যে আত্মশক্তি রয়েছে, তিনি ভগবান।" সাধন নিয়মিত করে যাও। অন্তর থেকে অন্তর্যামী যা শক্তি দেবেন, যেভাবে তোমাকে চালাবেন সেইভাবেই তোমার রথ চলবে। ষড়রিপু ও ইন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তির প্রবাহে রথটা পরিচালিত হলে সব ঘোর পঙ্কিল অন্ধকারে ডুবে যাবে। সদ্‌গুরু প্রদত্ত বিদ্যা ও উপদেশকে পাথেয় করে এগিয়ে চল। সদ্‌গুরু তোমায় ধরে রয়েছেন জেনো আর তোমায়ও 'মনে-প্রাণে' সদ্‌গুরুকে ধরে থাকতে হবে। 'মনে' অর্থে আত্মসত্তার বোধে এবং 'প্রাণে' অর্থে আত্মসত্তার মধ্যে। জেনো, সদ্‌গুরু ভিন্ন গতি নাহি আর। সদ্‌গুরুকে প্রকৃত পরম-বন্ধু মনে করতে হয়। *...ক্রমশঃ*

গুরুগীতা

(মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ যৌগিক ও সাধারণ অর্থ সম্বলিত)

যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯)

হৃদ্যম্বুজে কর্ণিকমধ্যে-সংস্থং
সিংহাসনে সংস্থিত-দিব্যমূর্ত্তিম্।
ধ্যায়েদ্‌গুরুং চন্দ্রকলাবতংসং
সচ্চিৎসুখাভীষ্টবরপ্রদানম্।।৬০
শ্বেতাম্বরং শ্বেতবিলেপযুক্তং
মুক্তাফলাভূষিতদিব্যমূর্ত্তিম্।
বামাঙ্গপীঠেস্থিতদিব্যশক্তিং
মন্দস্মিতং পূর্ণকৃপানিধানম্।।৬১
আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং
জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তম্।
যোগীন্দ্রমীড্যং ভবরোগবৈদ্যং
শ্রীমৎগুরুং নিত্যমহং ভজামি।।৬২

হৃদ্যম্বুজে কর্ণিকমধ্যে সংস্থা যস্য তং (স্থিতমিত্যর্থঃ যৎ) সিংহাসনং (তস্মিন্) সংস্থিতদিব্যমূর্ত্তিং, চন্দ্রকলাবতংসং, সচ্চিৎসুখাভীষ্টবর প্রদানং, শ্বেতাম্বরং, শ্বেতবিলেপযুক্ত, মুক্তাফলাভূষিত দিব্যমূর্ত্তিং (তদ্বিশিষ্টং) বামাঙ্গপীঠেস্থিতদিব্যশক্তিং, মন্দস্মিতং, পূর্ণকৃপানিধানম্, আনন্দম্ আনন্দকরং, প্রসন্নং, জ্ঞানস্বরূপং, নিজবোধযুক্তং, যোগীন্দ্রম্, ঈড্যং, ভবরোগবৈদ্যং (তম্) গুরুং ধ্যায়েৎ। (তৎ) শ্রীমৎগুরুং অহং নিত্যং ভজামি।। ৬০,৬১,৬২

সেই গুরু নিরাকার বলিয়া তাঁহার ধ্যান কিরূপে হয়? উপায়স্বরূপ বলিতেছেন যে, হৃদয়পদ্ম মধ্যে কূটস্থরূপে তাঁহার প্রকাশ আছে তাঁহারই ধ্যানের দ্বারা গুরুকে লাভ করা যায়। তিনি দিব্যমূর্ত্তিযুক্ত (অর্থাৎ জগৎ সে মূর্ত্তির আধারস্বরূপ নহে, পরন্তু জগতের ধ্যানবর্জিত হইয়া জগতোপরি আকাশে জীবের স্থিতি হইলে, সে মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়, নচেৎ জগৎ মনকে অধিকার করিয়া থাকিলে সে মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয় না)। হৃদয়ে (অর্থাৎ ভ্রূদ্বয়-মধ্যে) সেই কমলের বিকাশ আছে, তাহারই কর্ণিকা (বীজকোষ) মধ্যস্থিত সিংহাসনোপরি তাঁহার স্থিতি আছে (কবির সাক্ষীপাদ ৩য় শ্লোক দেখ)। সেই সিংহাসনের চারিদিকে চন্দ্রকলার দীপ্তির মত শ্বেতবর্ণের আভা ভূষণস্বরূপে বিকশিত রহিয়াছে। সদ্‌ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া তিনি সৎস্বরূপ, এবং চিৎস্বরূপ ব্রহ্মপদে সুখগতির জন্য তিনি নিয়ামকরূপে আছেন বলিয়া তিনি জীবের ঈপ্সিত-বরদাতা। তিনি শুভ্র পরিধানযুক্ত, অর্থাৎ জাগতিক বর্ণের মিশ্রণাভাবহেতু তিনি শুভ্রবর্ণযুক্ত দৃশ্যমান হয়েন। জাগতিক অপ্রীতিকর পূতিগন্ধ তথায় নাই বলিয়া, তিনি সুখসেব্য এবং মলশূন্য শ্বেতবিলেপন দ্বারা বিলেপিত বলিয়া অনুমিত হয়েন। তিনি ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখে (অর্থাৎ, স্থির ও প্রসন্নবদনে, এবং উচ্চহাস্য নহে, যদ্দ্বারা মন বিচলিত হয়) সাধকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন; ইহাতে বুঝা যায় যে তিনি পূর্ণভাবে কৃপানিধান (অর্থাৎ জীবকে শান্তি পথে লইয়া গিয়া পূর্ণভাবে কৃপাবিতরণের জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন)। দক্ষিণাবর্ত্ত দিয়া তাঁহার ধ্যান করিলে বামদিকে দিব্য শক্তির আবির্ভাব হয় (সেই শক্তিবলে জীব সর্বপ্রকার অনুভব শক্তি সম্পন্ন হয়, এবং সে কারণ শ্রীকৃষ্ণের রূপ 'বামে হেলা' বলিয়া বর্ণিত হয়, সে কারণ তাঁহার বামাঙ্গপীঠে দিব্যশক্তি আছে বলিয়া কথিত হইতেছে। তিনি আনন্দময় বলিয়া তদ্দর্শনে জীব আনন্দযুক্ত হয়। তিনি স্থির ও প্রসন্নভাবসম্পন্ন বলিয়া তদ্দর্শনে জীব প্রসন্নভাব প্রাপ্ত হয়। তিনি জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া তৎসঙ্গে জীব জ্ঞানসম্পন্ন হয়। তাঁহার সত্তা ভাবের অন্তর্গত নয় বলিয়া, তিনি সকল ভাবের অতীতাবস্থায় আছেন (অর্থাৎ, তাঁহা হইতে ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে এবং তিনি ভাবের অতীত), সুতরাং তিনি ভাবের অতীত হইয়া নিজভাবে যুক্ত আছেন, এবং সাধক তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিলে তিনি তাঁহার নিকট নিজবোধরূপ হয়েন (অর্থাৎ সাধকও তদ্বৎ হইয়া ভাবাতীত অবস্থা লাভ করে)। তিনি অভিন্নভাবে পরব্রহ্মের সহিত যুক্ত আছেন বলিয়া, জীবসম্বন্ধে তিনি পূজ্য ও যোগীন্দ্র (সাধক তাঁহার প্রতি আত্মসমর্পণ করিয়া অভিন্নভাবে থাকিলে, সেও পরব্রহ্মের সহিত অভিন্নভাবে যুক্ত হয়)। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে জগতের সহিত আসক্তিরূপ ভবডোরে বদ্ধ থাকিয়া ব্যাধিগ্রস্ত-জীব ব্যাধিমুক্ত হয়। এমত শ্রীমৎ-গুরুকে আমি নিত্য ভজনা করি।। ৬০,৬১,৬২

নিজবোধরূপ — ধৃতরাষ্ট্ররূপী অন্ধ জীবের ব্রহ্ম প্রত্যক্ষীভূত হন না, সে ইন্দ্রিয়াধীনে আছে অর্থাৎ সে নিজে কিছু দেখিতে পায় না, — চক্ষু যাহা দেখাইবে, কর্ণ যাহা শুনাইবে ইত্যাদি ভাবে বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে মাত্র তাহার অনুভূতি হয়, পরন্তু ব্রহ্ম অন্তরের বিষয়, তাঁহাকে আত্মা বলে,

ইন্দ্রিগণের তাঁহার নিকট যাইবার অধিকার নাই, সুতরাং এখানে আত্মাকে আত্মার দ্বারা দেখিতে হইবে — ইহাকেই নিজবোধরূপ কহে।

...ক্রমশঃ

(কলিকাতা—আদিনাথ-আশ্রম হইতে প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত)

ভ্রমণ

শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম বদ্রীনাথধাম ভ্রমণ কথা

(৯)

প্রাচীনকাল হতেই বদ্রীনাথধামকে ব্যাসতীর্থ বলা হয়ে থাকে কারণ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষি বেদ বিভাগ করে বেদব্যাস নামে আখ্যায়িত হন। তিনি বেদ অনুসারেই তাঁর বিভিন্ন পুরাণশাস্ত্র গ্রন্থগুলি রচনা করেন। অতি প্রাচীন তীর্থস্থান ও দেবভূমি বদ্রীনাথধামই ছিল ভারত-ঋষি মহামতি ব্যাসদেবের তপস্যাক্ষেত্র এবং মানা গ্রামের পথ ধরে এগিয়ে গেলে প্রথমেই পড়বে ব্যাসদেবের গুহা। শ্রীনারায়ণক্ষেত্রের সেই গুহাতে বসেই তিনি দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রায় ৩৬ বছর পর যখন যদুবংশ ধ্বংস হয় আর শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম তাঁদের লীলা সংবরণ করে অন্তর্হিত হন, তখন এই মহামতি ব্যাসদেবের উপদেশেই পঞ্চপাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দিয়েছিলেন সেই মহাপ্রস্থানের পথে।

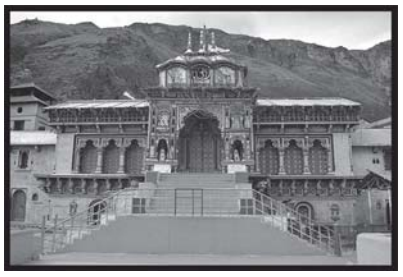

সময় গড়িয়ে আসে আমাদের প্রস্থানের, চিরতুষারাবৃত হিমগিরি অঞ্চলের মহাপুণ্য তীর্থস্থান বদ্রীনাথধাম থেকে হরিদ্বার আসার কর্মসূচীর দিন ঠিক হয়েছিল ইং ২০/৯/২০১২ তারিখে। সেপ্টেম্বর মাসেই ছিল শীতের সকালের পরিবেশ। আমরা সকলে প্রস্তুত হয়ে শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে, পথে দাঁড়িয়ে নীলকণ্ঠ পর্বতের শিখর ও তার বাহারি রঙের শোভাময় সৌন্দর্য্য দেখতে থাকি। সকালের ঝলমল আলোয় শ্রীশ্রীমা প্রত্যেকটি পর্বতের ভিন্ন ভিন্ন মনোরম সৌন্দর্য্যের অপরূপতাগুলি দেখতে থাকেন। এদিকে গুরুভাই পার্থদা গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে একদিকে ছবি তোলা আর একদিকে বারে বারে রাওয়ালজীকে ফোনে ডাকতে থাকেন। তাঁকে অনুরোধ করে মন্দির থেকে শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশ মতন প্রয়োজনীয় পূজার জিনিসগুলি আনার জন্যে, যাতে আমাদের যাত্রা শুরু করতে দেরী না হয়ে যায়। চালক ও আমাদের সন্ন্যাসী গুরুভাই প্রবোধানন্দজী মালপত্রগুলি গাড়ীতে ভাল করে বেঁধে নেওয়ার কাজে ব্যস্ত থাকেন। কোন রাজনৈতিক দলের পাহাড়-বন্ধের ডাক ছিল সেখানে সেইদিন। তাই সকাল থেকে কোন দোকান-পাট ছিল না খোলা। চা খাবার জন্য একটু ব্যস্ত হয়েছিলাম বটে কিন্তু, আমাদের কথা শুনে গাড়ীর চালক বলে যে, সে অনেকটা পথ ঘুরে এসেছে, কোন দোকান খোলা পায়নি। একথা শুনে চা খাওয়ার নেশা তখন থমকে যায়। শ্রীশ্রীমা ততক্ষণে গাড়ীতে উঠে বসেছিলেন, এমন সময় রাওয়ালজী দৌড়াতে দৌড়াতে এসে শ্রীশ্রীমায়ের প্রয়োজন মতন শ্রীশ্রীবদ্রীনাথজীর পূজার সময়ের সকল সামগ্রীগুলি অতি যত্নসহকারে দিয়ে যান ও তাঁর প্রাপ্য দক্ষিণা পেয়ে খুশি হয়ে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম ও আমাদের সকলকে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিতেই আমাদের গাড়ী চলতে শুরু করে। অক্ষয়ধাম ও মোক্ষধামের দেবতা শ্রীশ্রীবদ্রীনাথজীকে হাতজোড় করে প্রণাম জানাই ও মুখে জয়ধ্বনি দিই 'জয় বদরী বিশালজীর জয়'। অপার কৃপা প্রদানকারী ভগবান শ্রীবিষ্ণুজীর চিরস্থায়ী অবস্থানক্ষেত্র ছাড়তেই মনটা আনন্দহীন হয়ে পড়ে। গাড়ীর গতি উৎরাই এর পথে চলছিল। দুইদিকে পর্বতশৃঙ্গ আর মধ্যস্থল দিয়ে বয়ে চলেছে পুণ্যতোয়া নদী দুধগঙ্গা, স্বর্গগঙ্গা অলকানন্দা, মর্ত্যে অবতরণের জন্য আপন বেগে। যেন কবির গানের কথায় - 'নদী আপন বেগে পাগল পারা,' আমরা বেশ কিছুটা এগিয়ে আসতেই দেখি সারি দিয়ে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, পথের এদিক ওদিক দুই দিকেই। চলতে থাকা খারাপ আবহাওয়া ও রাত্রের বৃষ্টিতে পাহাড়ের গা-লাগোয়া গাড়ী চলাচলের পথটি ধ্বসে যাওয়ায়, তা বড়ই সংকীর্ণ হয়ে যায়। ফলে পাহারারত সেনাবাহিনী তাড়াতাড়ি করে লাগোয়া পাহাড়কে ডিনামাইট্ দিয়ে ফাটিয়ে, সংকীর্ণ পথকে প্রশস্থ করার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকায়, আমরা কিছুটা সময় আটকে পড়েছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে পথ পরিষ্কার হয়ে গেলে আমাদের গাড়ী চলতে থাকে। চলন্ত গাড়ীতে বসে শ্রীশ্রীমা পাণ্ডুকেশ্বরে অবস্থানকারী স্বামী নারায়ণগিরি নামে এক সাধুবাবার কথা বলেন এবং সেখানে গাড়ী থামিয়ে সাধুবাবার আশ্রমের খোঁজ নিতে বলেন। সাধুবাবার এক শিষ্য সেখানের পোষ্টমাস্টার মহাশয়, তাঁর

নিকট হতে সকল সংবাদ পাওয়া যাবে সেকথাও শ্রীশ্রীমা আমাদের বলেছিলেন। তাই গাড়ী পাণ্ডুকেশ্বর আসতেই গুরুভাই পার্থদা নেমে পোষ্টমাস্টারের খোঁজ ও স্বামী নারায়ণগিরি মহারাজের আশ্রমের পথ নির্দেশ জানার উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

পার্থদা কিছুক্ষণের মধ্যে এসে শ্রীশ্রীমাকে জানালেন যে, স্বামীজী আশ্রমেই আছেন তবে বেশ কিছুদিন পূর্বে তাঁর শরীরে বড় ধরনের অসুখের ফলে দেহের একটি অংশ অকেজো হয়ে যায়, ফলে শিষ্যের হাতে সবরকমের সেবা নিতে হয় তাঁকে এবং যেখানে তাঁর গুফা-আশ্রম সেইস্থান বড়ই দুর্গম এবং সেখানে যাতায়াত করাও মুশকিল। পার্থদা আরও বলেন যে, তিনি ও দুই গুরুভাই বরুণ ও প্রবোধানন্দজীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আশ্রম ও পথের অবস্থা দেখে ফোন করবেন আমাদেরকে। স্বর্গগঙ্গা অলকানন্দার তীরে গাড়ীতে বসে শ্রীশ্রীমা, আমি ও গাড়ীর চালক অপেক্ষা করছিলাম তাঁদের ফোনের জন্য। এমন সময় গাড়ীর চালককে পার্থদা ফোন করে জানান যে, তাঁরা সাধুবাবার নিকট পৌঁছে গিয়েছেন। চালক তখন তার ফোনটি শ্রীশ্রীমাকে দেয় কথা বলার জন্য, ওদিক থেকে পার্থদা বলতে থাকেন যে, তিনি মহারাজজীকে শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে বেশ কিছু কথা বলেছেন। মহারাজজী তাঁর সেবককে দিয়ে তাঁদেরকে বসতে দিয়েছেন ও চা-বিস্কুট খেতে দিয়েছেন কিন্তু, এই ভঙ্গুর পাহাড়ী পথে শ্রীশ্রীমার পক্ষে আসা একেবারেই অসম্ভব তাও জানান, এই সব উপদেশমূলক কথা শুনে শ্রীশ্রীমা অভিযোগের সুরে পার্থদাকে বলতে থাকেন যে, ''তোরা যেতে পারলি আর আমি যেতে পারবো না? তোরা ক-জন্ম পাহাড়ে থেকেছিস ও সাধনা করেছিস? আর আমি ক-জন্ম পাহাড়ে থেকে সাধনা করেছি জানিস? তোরা ওখানেই থাক, আমি সংবেদানন্দকে নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছি।'' এইসব কথা শুনে আমার বুকের ভিতরে ধক্-ধক্ আওয়াজ হতে থাকে আর ''জয়গুরু, জয়গুরু'' বলতে থাকি, ততক্ষণে দেখি শ্রীশ্রীমা গাড়ীর দরজা খুলে ফেলেছেন। আমি শীঘ্র গাড়ী থেকে নেমে শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে সেই দুর্গম পাহাড়ী পথের পাকদণ্ডীর মত সরু পুরানো বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে যেখান দিয়ে কোনমতেই একসাথে দুজনে নামা যায় না, সেই পথে ভগবানকে স্মরণ করে শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে নামতে থাকি। প্রবল অসুবিধাযুক্ত পথে শ্রীশ্রীমা আমাকে আদেশ দেন যে, ''আমাকে ধরতে হবে না, তুমি তোমার লুঙ্গি সামলে নিয়ে আস্তে আস্তে নামো, আমি ঠিক নেমে যাব চিন্তা কোরো না।'' একে শ্রীশ্রীমায়ের ভারী শরীর তার উপর সিঁড়ির কোন দিকেই ধরবার মতন রেলিং নেই, তা দেখেতো আমার অন্তরাত্মা আঁৎকে ওঠে। শ্রীশ্রীমাকে দেখে উপরে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ীর চালকের অবস্থা তখন আমারই মতন অথচ এই দৃশ্য ছিল দেখবার মতন, ধীর-স্থির অবস্থাযুক্ত 'শ্রীশ্রীদেবী দুর্গামাতা' যেন পাহাড় থেকে নেমে আসছেন তাঁর সিদ্ধ মহাত্মা সন্তানের অন্তরের ডাকে সাড়া দিয়ে তার আশ্রমে উপস্থিত হবার জন্য। হিমালয়ের কোলে ও অলকানন্দার তীরে সেই অপূর্ব দৃশ্যখানি আমার কাছে কোনদিনই ভুলে যাওয়ার মতন নয়। হিমালয়ের উঁচু পাহাড়ী পথ ধরে দেবীর আগমন (শ্রীশ্রীমায়ের) যখন অলকানন্দার প্রবাহিত জলধারার কাছাকাছি চলে আসে তখন, হঠাৎ দেখি পার্থদা শ্রীশ্রীমায়ের কাছে বকা খেয়ে সন্ন্যাসী গুরুভাই প্রবোধানন্দজীকে পাঠিয়ে নিজেরা পিছন পিছন আসছেন। ততক্ষণে অনেকটাই পথ আমাদের নেমে আসা হয়ে গিয়েছে, এরপর কিছুটা এব্ড়ো-খেব্ড়ো পাহাড়ের গা ঘেঁষা সমতল পথ, পাহাড়ের গা বেয়ে সেই পথের উপর দিয়ে অবিরাম ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে ঝর্ণার স্বচ্ছ জলের ধারা। সেই জলধারা সন্তর্পণে পেরিয়ে আমরা উপস্থিত হয়েছিলাম 'স্বামী নারায়ণগিরি' মহারাজের গুহায়িত আশ্রমে। স্বামী নারায়ণগিরি মহারাজ হলেন একজন সিদ্ধ মহাত্মা, তাঁর জন্মস্থান হল নেপাল এবং তাঁর গুরুমহারাজ ছিলেন 'সোম্বারী বাবা'। স্বামীজীর বয়স তখন প্রায় ১০৭ বছর এবং তিনি প্রায় ৫০ বছর যাবৎ পাণ্ডুকেশ্বরে স্বর্গগঙ্গা অলকানন্দার তীরে পাহাড়ের গুহায় বসে সাধনা করেছিলেন।

স্বামী নারায়ণগিরি মহারাজের গুহার পাশে অলকানন্দার ধারে, পাথরের টুকরো দিয়ে সাজানো উঁচু বেদীর উপর বিছানায় বসে থাকা মহাত্মাজীর পাশে শ্রীশ্রীমা গিয়ে দাঁড়াতেই, তিনি প্রণাম জানান ও জগদম্বামাতার উপস্থিতির আনন্দে তাঁর চোখে জল এসে যায়। আমিও মহাত্মাজীকে প্রণাম জানাতেই তিনি ইশারায় বসতে বলেন। সাধুবাবার সৌম্যকান্তি অত্যুজ্জ্বল চেহারা, জটাযুক্ত মস্তকের উপর পশমের টুপি পরা ও মুখমণ্ডল শুভ্র দাড়ি-গোঁফে ঢাকা। কম্বলের মধ্যে পা ছড়িয়ে বসেছিলেন তিনি কিছুটা রোদ্দুর ও কিছুটা পাশের গাছের ছায়াঘেরা তাঁর বসার স্থানে। তাঁর পায়ের কাছে বসে স্বামী নারায়ণগিরি মহারাজের উদ্দেশ্যে বলা শ্রীশ্রীমায়ের কিছু জীবনকথা শুনছিলাম। স্বামীজীর মনে শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী শিষ্য (আমাদেরকে) দেখে কিছু প্রশ্ন জেগেছিল, যারফলে শ্রীশ্রীমা তাঁর গুরুমহারাজ অর্থাৎ আমাদের শ্রীশ্রীবাবার কথা বলতে থাকেন। হিমালয়ের ব্যাসপীঠে অবস্থিত শ্রীশ্রীবাবার গুরুমহারাজ শ্রীশ্রীনাঙ্গাবাবার

কাছে থেকে ২৮ বছর ধরে হঠযোগ সাধনায় সিদ্ধ হয়ে, স্বামী সচ্চিদানন্দ পরমহংস উপাধি লাভ করে, পাহাড় থেকে নেমে এসে হাওড়া জেলার বাক্সাড়ায় তাঁর বাড়ীতে থেকে ও তাঁর গুরুদেবের আদেশে শ্রীশ্রীমাকে খুঁজে বের করে ক্রিয়াযোগ দীক্ষা প্রদান করা, যা তিনি হাওড়ার ত্রিকালজ্ঞ যোগীগুরু শ্রীশ্রীনিতাইবাবার নিকট হতে ক্রিয়াযোগ দীক্ষার মাধ্যমে পেয়েছিলেন ইত্যাদি মূল্যবান কথাগুলি শ্রীশ্রীমা বলতে থাকেন। মহারাজজীর মনে জমে ওঠা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়ে তিনি স্থির হয়ে শ্রীশ্রীমায়ের দিকে তাকিয়ে থেকে, মাথা নীচু করে যেমন বসেছিলেন তেমন একই অবস্থায় আত্মমগ্ন হয়ে যান। কারণ, মনের প্রশ্ন, চিন্তা, বাসনা ও মনের মধ্যে উৎপন্ন হওয়া যে কোন প্রকারের পরিকল্পনা শ্রীশ্রীমা যে অনায়াসেই বুঝতে সক্ষম তা মহারাজজী বুঝতে পেরেছিলেন। সাধুবাবার ওখানে যে কুঠিয়া আছে, তার মধ্যে কিছু সন্ন্যাসী শিষ্য প্রায় সময়ই সাধনারত থাকেন। তাঁরাই তাঁদের গুরুদেবের সেবার ব্যাপারে সচেতন থাকেন। সেই কুঠিয়ার মধ্যেই মহারাজজীর আসন, হোমকুণ্ড, ত্রিশূল ইত্যাদি রয়েছে। তিনি মন্ত্রদীক্ষা ও যোগদীক্ষা দুই-ই তাঁর শিষ্যদের আধার বুঝে দিয়েছেন। স্বর্গগঙ্গা অলকানন্দার তীরে মহারাজজীর আশ্রমে তাঁর নিকট বসে মনের মধ্যে এক অনাবিল আনন্দের সৃষ্টি হয়েছিল কারণ, শ্রীশ্রীমা সকলকে বলে থাকেন যে, কোন তীর্থে গেলে ভালো মহাত্মা সাধু দর্শন করে আসতে হয়। সত্যই শ্রীশ্রীবদ্রীনাথজীর কৃপায় এবং শ্রীশ্রীমায়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় ও আগ্রহের ফলে, তীর্থ পথে ফেরার সময় উচ্চকোটী সম্পন্ন এক যোগসিদ্ধ মহাত্মার দর্শন ও প্রণামের মাধ্যমে স্পর্শলাভের দ্বারা তাঁর আশীর্বাদ প্রাপ্তির ফলেই হয়েছিল মনে প্রকৃত আনন্দের সৃষ্টি। সাধুবাবার নিকট যেখানে বসেছিলাম সেই স্থানের পাশে রোদ্দুরে একটি চটের উপর কিছু আখরোট শুকোতে দেওয়া ছিল। আমার দৃষ্টি সেদিকে যেতেই সাধুবাবা ইশারায় সবগুলি নিয়ে আসতে বলেন। আমি হাসতে হাসতে শ্রীশ্রীমাকে জানালে তখন শ্রীশ্রীমা আদেশ করেন যে, ''না একদম নয়, তোমরা পাঁচজন এসেছো কেবল পাঁচটি নেবে। এখানে যারা বাবার কাছে থাকে তারা খাবে না! বাকীগুলো তাদের জন্য থাকুক।'' শ্রীশ্রীমায়ের কথা শুনে সাধুবাবা হাসতে থাকেন এবং আমিও হাসতে হাসতে পাঁচটি আখরোট নিয়ে বাবাকে দেখিয়ে পকেটে নিই। সাধুবাবা শ্রীশ্রীমায়ের জন্য চায়ের ব্যবস্থার চিন্তা করতেই শ্রীশ্রীমা বলে ওঠেন যে, ''অনেক দেরী হয়ে গেছে বাবা, আজকে হরিদ্বার ফিরতে হয়তো আমাদের রাত্রি হয়ে যাবে। আর অপেক্ষা করবো না, তুমি আমাদের সকলকে অনুমতি দিলে আমরা রওনা হবো।'' মাথা নীচু করে বসে থাকা মহারাজজীর দৃষ্টি ছিল শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণের দিকে, হাতজোড় করে প্রণাম জানিয়ে ও মাথা নেড়ে অনুমতি দিতেই, আমরা সকলে মহাত্মাজীকে প্রণাম করে ফিরে আসি তাঁর পাহাড়ের গুহায় অবস্থিত আশ্রম ও তারই গা-লাগোয়া চিরসাক্ষী স্বরূপা, প্রবাহিত হয়ে চলা স্বর্গগঙ্গা অলকানন্দার নিকট হতে। সেখান থেকে ফিরে আসার পথে শ্রীশ্রীমা আমাদেরকে বলেছিলেন যে, স্বামী নারায়ণগিরিবাবা মাতৃদর্শনের আশায় অনেক বছর যাবৎ অপেক্ষা করেছিলেন। আজ তাঁর সেই আশা সম্পূর্ণ হয়েছে। তিনি এই হিমালয়ের বুকে একজন Lion সাধুবাবা বলতে পারো, তবে হয়তো তাঁর এই আশা পুরণের পর বেশীদিন আর এই দেহ ধরে রাখার ইচ্ছা থাকবে না, তিনি তাঁর গুরুদেব সোম্বারীবাবার নিকট হতে দীক্ষা পেয়ে তিব্বতেই ১২ বছর কঠোর সাধনা করেছেন, তারপর তিনি বদ্রীক্ষেত্র পাণ্ডুকেশ্বরের এইস্থানে সাধনায় প্রায় ৫০ বছর অতিক্রান্ত করেছেন। তাহলে বোঝো কত বড় ক্ষমতাশালী সাধুদর্শন আজ তোমাদের হল। সত্যই আমরা শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় এই তীর্থযাত্রায় নিজেদের সৌভাগ্যের সফলতায় আনন্দিত হয়ে উঠেছিলাম।

পাণ্ডুকেশ্বরে আছে একটি ছোট সঙ্গম, ভিউন্দর গঙ্গার সরু একটি জলধারা পর্বতের চূড়া বেয়ে নেমে এসে পাণ্ডুকেশ্বরে মিলিত হয়েছে অলকানন্দার সঙ্গে। সেখানের মানুষজনদের নিকট সেই সঙ্গমে পুণ্যস্নানের মহিমাও বিরাট বলেই গণ্য। সেই সঙ্গমস্থলের কাছেই হচ্ছে পাণ্ডুকেশ্বর তীর্থ। বদ্রীনাথধাম যাত্রাপথে যেমন আমরা পঞ্চপ্রয়াগ পেয়ে থাকি তেমনই জানা যায় যে, সেই পথেই রয়েছে পঞ্চবদরী। যার প্রথমটি হল বদরীনারায়ণ ও দ্বিতীয়টি পাণ্ডুকেশ্বরে যোগবদরী, যা আমাদের যাত্রাপথে পড়েছিল। তাছাড়া বাকী তিনটি হল ধ্যানবদরী, আদিবদরী ও ভবিষ্যবদরী। যা আমাদের তীর্থপথের কয়েকটি স্থান থেকে বেশকিছু দূরে যোশীমঠ এলাকার মধ্যেই অবস্থিত।

আমাদের গাড়ী পাণ্ডুকেশ্বর ছাড়িয়ে যোশীমঠের দিকে নেমে চলতে থাকে। ব্রীজের মাধ্যমে নদী পেরিয়ে এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে যাওয়ার আনন্দ যেন নিত্য নূতন বলে মনে হয়। আকাশ ছিল পরিষ্কার, তাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের খুঁটিনাটিগুলি দৃষ্টিতে আসে স্বচ্ছতার সঙ্গে। মনের আনন্দকে করে তোলে মুগ্ধকর। তা দেখতে দেখতে চলে আসি যোশীমঠ এলাকায়, সেখানে একটি ভালো হোটেলে উঠে একটু বিশ্রাম ও দুপুরের খাবার খেয়ে রওনা দিয়েছিলাম

হরিদ্বারের উদ্দেশ্যে। পাহাড়ী পথ হলেও উতরাই পথ যেন গাড়ীকে উৎসাহের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে আসে, সকল প্রয়াগতীর্থ অতিক্রম করিয়ে এবং প্রাচীন তপোভূমি হৃষীকেশ স্পর্শ করে হরিদ্বারে রাত্রি ৯-৩০ মিঃ নাগাদ পৌঁছিয়ে সকলেই ক্লান্ত, তবুও বলা ছিল হরিদাসধামে রাত্রের খাবারের কথা। তার উপর পরের দিন অর্থাৎ ইং ২১/৯/২০১২ তারিখেই দিল্লী হয়ে কলকাতা ফিরে আসার কথা।

পরের দিন ভোরে উঠে রওনা দিয়েছিলাম হরিদ্বার থেকে দিল্লী। দিল্লী এয়ারপোর্ট হয়ে দমদম এবং সেখান থেকে কলকাতায় আমাদের আশ্রমে পৌঁছাই। সফল হয়েছিল শ্রীশ্রীমায়ের তীর্থযাত্রা ও তাঁর পরিকল্পিত শ্রীশ্রীমাতা অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বর বাবা এবং লক্ষ্মী-জনার্দনজীউয়ের মন্দির স্থাপনের কর্মগুলি। এছাড়া সফল হয়েছিল আমাদের সকলের মনের ইচ্ছা, যা হিমালয়ের দেবভূমির এই মহাপুণ্য তীর্থযাত্রার সাথে শ্রীবিষ্ণুতীর্থের দেবতা শ্রীশ্রীবদ্রীনাথজীর দর্শন ও তাঁর কাছে একরাত্রি থেকে হিমাদ্রিপতি নগাধিরাজকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা। অতি আন্তরিকতার ও শ্রদ্ধার সাথে শ্রীশ্রীবদ্রীনারায়ণজীর শ্রীচরণে জানাই আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম।

ওম্ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

—মাতৃচরণাশ্রিত স্বামী সংবেদানন্দজী

— সমাপ্ত —

যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে

প্রশ্ন ৪৫ : 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' অবস্থা কাকে বলে?

উত্তর : যে জীব এই জগতে সর্বময়, আনন্দময় আর শান্ত হইয়া সর্বত্র বিচরণ করেন, সেই জীবকে সর্বজ্ঞ বলে। যে সাধকের পরমের উপলব্ধি হইয়া গিয়াছে, যিনি আত্মাকে পরিপূর্ণ উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহার এই মায়া প্রপঞ্চের জগতের সঙ্গে আর কোন প্রকার মানসিক বন্ধন থাকে না; এই প্রকার ব্যক্তি সর্বময় হইয়া যান। তিনি সকলকেই আত্মস্বরূপ দেখিয়া থাকেন। তাঁহার দ্বৈতভাব চলিয়া যায়। ইনিই সকলকে 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' উপলব্ধি করিয়া থাকেন। ইনি সকলকেই প্রেমের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন; তাঁহার অন্তরে কাহারও প্রতি রাগদ্বেষাদি, ঘৃণাবোধ থাকে না। যিনি সর্বজ্ঞ তিনিই 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' দর্শন করিতে সক্ষম।

প্রশ্ন ৪৬ : ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তির লক্ষণ কি?

উত্তর : একাকী, কামনা রহিত, শান্ত, স্থির অটল চিত্ত সম্পন্ন অর্থাৎ যিনি চিন্তারহিত অবস্থায় অবস্থান করেন এবং ঈর্ষাশূন্য হৃদয় সম্পন্ন যাঁহার; যিনি বালক-স্বভাববৎ, তাঁহাকেই ব্রহ্মজ্ঞানী বলা হয়। ব্রহ্মজ্ঞানী এবং সামান্য ব্যক্তির মধ্যে ব্যবহারগতভাবে জগতে বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সাধারণ মানুষের মতই চলাফেরা করিয়া থাকেন, খাওয়া-দাওয়া করেন, কর্ম করেন, ঘুমান, কথাবার্তা বলেন কিন্তু তিনি ঐ সকল কর্ম যেন নাটকবৎ করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে জাগতিক বিষয়ের প্রতি তাঁহার কোনই আসক্তি থাকে না, তাঁহার অন্তরে কোন কামনা বাসনাও থাকে না বাহ্যিক বিষয়ের কোন সংকল্পও থাকে না এবং তিনি অন্তরে সর্বদাই আত্মস্থিত থাকেন। আত্মস্থিত ব্যক্তি সর্বদাই শান্ত এবং নির্বিকার থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞানী আত্মস্থিত অবস্থায় অবস্থান করিয়া সর্বদা সেই আত্মপুরুষের নির্দেশেই তাঁহার জীবনধারাকে প্রবাহিত করিয়া থাকেন। এই সমস্ত হইল ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তির লক্ষণ। অন্ধমানব, মায়াবদ্ধ জীব তাঁহাদের সাধারণ সামান্য ব্যক্তি বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন কিন্তু সাধারণে তাঁহাদের সংসর্গে আসিলে পরে তখন দেখা যায় যে সাধারণের মধ্যে স্বভাবের পরিবর্তন হইয়া সাধারণ অসাধারণে পরিবর্তিত হইয়া যান। ব্রহ্মজ্ঞানী 'মহাত্মা' হন। গুরুপ্রদত্ত কর্ম নিত্য সাধন করিতে করিতে অন্তরে উপলব্ধির মধ্য দিয়াই মহাত্মাকে বুঝিতে পারা যায়। **—শ্রীশ্রীমা সর্বাণী**

আশ্রমের আগামী অনুষ্ঠান সূচী

শ্রীশ্রীমায়ের প্রবচন — ২৬শে আগষ্ট,রবিবার সকাল ১১টা
জন্মাষ্টমী — ৩রা সেপ্টেম্বর, সোমবার, সন্ধ্যা ৭টা
আধ্যাত্মিক সভা — ৩০শে সেপ্টেম্বর, রবিবার, সন্ধ্যা ৭টা
মহালয়া — ৯ই অক্টোবর, মঙ্গলবার
নবরাত্রি দুর্গাপূজা — ১০-১৯শে অক্টোবর (১০ দিন ব্যাপী)
১৩ই অক্টোবর (পঞ্চমী): সন্ধ্যায় নৃত্যানুষ্ঠান
১৬ই অক্টোবর (সপ্তমী): সন্ধ্যায় সঙ্গীতানুষ্ঠান
১৭ই অক্টোবর (অষ্টমী): শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী বাবার তিরোভাব দিবস উপলক্ষ্যে ভাণ্ডারা
১৮ই অক্টোবর (নবমী): শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর মহাপ্রসাদ
কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা— ২৪শে অক্টোবর, বুধবার

নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা

(৩২)

দেবতা বিষ্ণু— (*পূর্ব প্রকাশিতের পর...*)

বিষ্ণুর তৃতীয় পদ নিয়ে বৈদিকসমাজে অনন্তরহস্য দানা বেঁধেছিল। ঋষি বলেছেন এই তৃতীয় পদেই আছে মধুর উৎস 'বিষ্ণোঃ পরমে পদে মধ্ব উৎসঃ'। যাঁরা জ্ঞানী তাঁরাই কেবল বিষ্ণুর সেই পরমপদের রহস্য জানতে পারেন। লৌকিক দৃষ্টিতে সেই তত্ত্ব বোঝা না গেলেও তত্ত্বদৃষ্টিতে তত্ত্বটি বোধগম্য হয়। তাঁকে জানতে গেলে সদা-জাগ্রত ও মেধাবী হতে হবে। বিষ্ণুপদের মধু ব্রহ্ম-বিদ্যার অপার রহস্যাস্বাদ যুক্ত আনন্দ। সূর্যলোকের মধ্যেই সৃষ্টির অসীম রহস্য লুকিয়ে আছে। বিষ্ণু জগৎকে পালন করছেন সেই অসীম লোকে বসে।

বিষ্ণু বা সূর্যের রশ্মি পৃথিবীলোকে এসে অগ্নিতে রূপান্তরিত হয়। এখানকার গাছপালা তথা জীবজগৎ যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রক্রিয়ায় আলোক-সংশ্লেষ করে তার দ্বারাই তো জীবের জীবন সুরক্ষিত। সূর্যলোক থেকে আলোক ধেনুরা, পৃথিবীতে বিচরণ করতে আসে, ঘাসের সারি মাথা তোলে, শ্যামল বনে সবুজ পাতা জন্মায়। অগ্নি সমস্ত ভূতের মধ্যে প্রবেশ করে প্রাণসমূহ ধারণ করে বিষ্ণু হয়েছেন এই তত্ত্ব মহাভারতের রচয়িতাও জানতেন। শান্তিপর্বে তাই বলা হল —'অগ্নির্বিষ্ণুঃ সর্বভূতস্যানুপ্রবিশ্য প্রাণান্ ধারয়তীতি'। বিষ্ণুর সঙ্গে গাভীদের সম্পর্কও কাল্পনিক নয়। ঋগ্বেদের ১/২২/১৮ মন্ত্রে বিষ্ণুকে গোপা বলা হয়েছে -'বিষ্ণর্গোপা অদাভ্যঃ'। টীকাকার 'গোপ' শব্দের অর্থ করেছেন 'জগতের রক্ষক'। অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু শব্দটির অর্থ করেছেন 'গাভীদের রক্ষক'। পুরাণকারেরা কৃষ্ণ-বিষ্ণুর গোপালক মূর্তি সম্ভবতঃ বেদ ও পুরাণের তত্ত্ব থেকেই পেয়েছিলেন। ঋষি দীর্ঘতমা ১/১৫৪/৬ মন্ত্রে বলেছেন - 'বিষ্ণুর পরমপদে ভূরিশৃঙ্গ বিশিষ্ট ক্ষিপ্রগামী গাভীরা বিচরণ করে।' কথাটা পুরাণকারেরা এই অর্থেই বুঝেছেন বলে সূর্যকে গোসমূহের পরমগুরু বলে অভিহিত করেছেন — 'গবাং সূর্যঃ পরো গুরুঃ'। ডক্টর আর. জি. ভাণ্ডারকারও মনে করেছেন যে - কৃষ্ণের ব্রজলীলার কাহিনী খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে কল্পিত হয়েছে এবং সেই কাহিনীর অধিকাংশটাই বৈদিক ইন্দ্র ও বিষ্ণুর আখ্যান থেকে নেওয়া। পুরাণে কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র, কৌস্তুভ প্রভৃতির মধ্যে সূর্যের দীপ্তির পূর্বরূপকে পেয়েছেন পণ্ডিতেরা। পুরাণের কৃষ্ণের একটা রূপ বেদের থেকে এলেও সেখানে রাধা ছিল না। অনেক পরে লেখা অথর্ববেদের গোপাল-তাপনী উপনিষদের গান্ধর্বী বাকের মধ্যে বৈষ্ণবেরা রাধার সন্ধান পেয়েছেন। বিষ্ণুকে গোপ বলার এসব তাৎপর্য্যের ব্যাপারে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও সচেতন ছিলেন। এসব ভাবনার উৎস ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলে প্রজাপতি ঋষি দৃষ্ট ৫৫ সূক্তে পাওয়া যায়।

'নি বিবেতি পলিতো দূত আস্বন্তর্মহাংশ্চরতি রোচনেন।
বপূংষি বিভ্রদভি নো বি চষ্টে মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্।।
বিষ্ণুর্গোপাঃ পরমং পাতি পাথঃ প্রিয়া ধামান্যমৃতা দধানঃ।
অগ্নিষ্টা বিশ্বা ভুবনানি বেদ মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্।।'

(৩/৫৫/৯-১০)

রমেশ দত্তের অনুবাদ হল — 'পালয়িতা দূত অগ্নি ঐ সকল ওষধিমধ্যে ব্যাপ্ত আছেন। তিনি মহান্। তিনি সূর্যের সাথে দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে বিচরণ করেন। তিনি নানাবিধ রূপ ধারণ করে আমাদের দর্শন করেন। দেবগণের মহৎ বল একই।। রক্ষক বিষ্ণু প্রিয়তম অক্ষয় তেজ ধারণ করে পরম স্থান রক্ষা করেন। অগ্নি সমস্ত ভূতজাতকে জানেন। দেবগণের মহৎ বল একই।।'

এই মন্ত্রে 'বিষ্ণু' শব্দের ব্যাখ্যায় সায়ণ তাঁকে বহুব্যাপক অগ্নি বলেছেন। বৈদিকধারায় সূর্য ও অগ্নির মধ্যে পার্থক্য নেই, কারণ যে সূর্য্যাগ্নি দ্যুলোকে বর্তমান তিনিই আবার পৃথিবীলোকে অগ্নি রূপে বিরাজমান। সামবেদের গৃহ্য-সূত্রে বিষ্ণুকে আহবনীয় অগ্নি বলা হয়েছে। যেহেতু দ্যুলোকে স্থিত অগ্নি প্রকৃতপ্রস্তাবে সূর্যই, তাই অগ্নিতে আহূতি দিলে সেই আহূতি সূর্যলোকে গমন করে। শাস্ত্রকারের ভাষায় 'অগ্নৌপ্রস্তাহূতিঃ সম্যক্ আদিত্যমুপতিষ্ঠতে।'

বেদের বিষ্ণু বা সূর্য উপাসনাকে অবলম্বন করে ত্রিলোকের দেবভাবনা একটা সূত্রে গ্রথিত হয়ে হয়তো একেশ্বরের মধ্যে বহুত্বের সঙ্গতিবিধান করেছিল। যজ্ঞাগ্নিই যে বিষ্ণু একথা কৃষ্ণযজুর্বেদের একটি মন্ত্রে আখ্যাত হয়েছে —

বিষ্ণোঃ শংযোরহং দেবযজ্যয়া যজ্ঞেন প্রতিষ্ঠাং
গমেয়মিত্যাহ যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুর্যজ্ঞ এবাস্ততঃ প্রতিতিষ্ঠতি।।

(১/১/৭/৪)

অর্থাৎ, বিষ্ণুর মুখ আমি দেবোদ্দিষ্ট যজ্ঞের দ্বারা লাভ করবো, বিষ্ণুই হলেন যজ্ঞ।

...ক্রমশঃ

— অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হয়গ্রীব মাধব - হাজো

ভারতবর্ষ সাধনক্ষেত্র, এই সাধনক্ষেত্রে বিভিন্ন সাধক বা পূজকগণ কখন তাঁদের আরাধ্যা দেব-দেবীকে কিরূপে পূজা করবেন তা তাঁদের অন্তরেই স্ফুরিত হয় এবং কখনও কখনও তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে আবার কখনও কখনও তার কোনও বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় না। ফলে অন্তঃস্থিত ঐ খবর কেবল সাধক-পূজকগণই জানতে পারেন; নতুবা সবই রয়ে যায় সাধারণ মানুষের জানা-চেনার বাইরে। তবে কখনও যদি তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তবে তার রূপ আমরা দেখতে পাই তাঁদের অর্চিত নানা দেব-দেবীর মূর্তি বা তাঁদের স্থাপিত নানা স্থপতির মধ্যে, এইরূপ একটি মন্দির ও তার দেবতার রূপের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই অসমের কামরূপ জেলায় অবস্থিত প্রাচীন গ্রাম 'হাজোতে'।

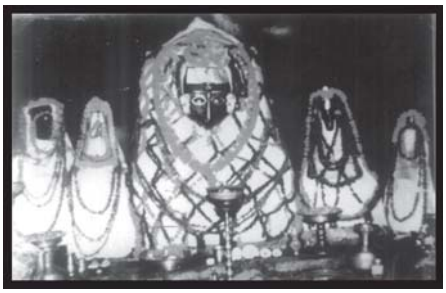

হয়গ্রীব মাধব

গৌহাটী শহর হতে প্রায় ৩২ কি.মি. পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর পারে অবস্থিত 'হাজো' অসমের ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানসমূহের মধ্যে অন্যতম। এখানকার মণিকূট পর্বতে অবস্থিত 'হয়গ্রীব মাধব' মন্দিরটি কেবলমাত্র হিন্দু নয়; বৌদ্ধ-লামাদের নিকটও সমানভাবে পূজিত। বিভিন্ন সময়ে তিব্বত, ভুটান এবং সুদূর চীনদেশ হতেও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা এই মন্দির দর্শন করতে আসেন। এই সকল দেশের পরিব্রাজকগণ হাজোকে স্বর্গভূমি বলে জ্ঞান করে এই তীর্থস্থান দর্শন করতে আসেন। তাঁরা আরও বিশ্বাস করেন যে এখানে বুদ্ধদেবের অস্থিভস্ম রক্ষিত আছে। তিব্বতের প্রাচীন গ্রন্থে হয়গ্রীব মন্দিরকে বৌদ্ধ-চৈত্য বলে উল্লেখ করা হয়ছে। তিব্বতীরা বলেন যে লামাপন্থার প্রবর্তক 'সিদ্ধ পদ্মনাভের' দেহাবসান ঘটে হাজোর ঐ পর্বতে। পদ্মনাভের নামে এই চৈত্যটি নির্মাণ করে বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। মন্দিরের 'বুঢ়া মাধব' বা দ্বিতীয় মাধব হলেন বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্তি। পূর্বে এস্থানে বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য ছিল এবং পরবর্তী সময়ে হিন্দুধর্ম প্রাধান্য লাভ করলে ঐ বৌদ্ধ-চৈত্য হিন্দু মন্দিরে পরিণত হয়। এই মন্দির হিন্দু-মন্দিরে রূপান্তরিত হলে ঐ বৌদ্ধমূর্তিটি হিন্দু দেবতায় পরিণত হন।

মন্দির পত্তনের ইতিহাস হতে পাওয়া যায় যে প্রাচীন মন্দিরটি কুখ্যাত কালাপাহাড়, মাতা কামাক্ষ্যাদেবীর মন্দির ধ্বংস করার পর হয়গ্রীব মন্দিরেরও অনেক ক্ষতি করেন। বর্তমান মন্দিরটি ১৫৮৩ খৃঃ কোচ বংশের রাজা রঘুদেব নারায়ণ পুনঃর্নির্মাণ ও সংস্কার করেন। কোন কোন ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে ষষ্ঠ শতকে পাল বংশের রাজত্বকালে এটি নির্মিত হয়। এই মন্দিরের দেবতার মূর্তিগুলি শ্রীক্ষেত্রের (পুরী) শ্রীজগন্নাথ দেবের মূর্তির অনুরূপ উপাদানে নির্মিত। এই মূর্তি সৃষ্টির কাহিনী আমরা পাই 'যোগিনী তন্ত্রে'। যদিও কাহিনী মূলতঃ শ্রীক্ষেত্রের শ্রীজগন্নাথ দেবের সৃষ্টি কাহিনী, তবে তার মধ্যেই পাওয়া যায় হাজোর 'হয়গ্রীব মাধবের' মূর্তি রহস্য।

যোগিনী তন্ত্রের কাহিনী অনুসারে উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দেবমূর্তি স্থাপনের বাসনায় এক বিরাট যজ্ঞ করেন এবং যজ্ঞ যথাবিধি সমাপনান্তে রাত্রে নিদ্রাকালে ভগবান বাসুদেব স্বপ্নে দেখা দেন। ভগবান তাঁর যজ্ঞে সন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে আদেশ দেন যে, রাজা যেন অতি প্রত্যুষে নির্জনে একটি কুঠার (পরশু) হস্তে সমুদ্রতীরে গিয়ে যে নাম-বিহীন অদ্ভুত বৃক্ষটি দেখবেন তাকে কুঠার দ্বারা সাতভাগে ভাগ করে মূলভাগ দিয়ে দেবতার প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে যথাবিধি নিয়ম অনুসারে স্থাপিত করে পূজার্চনা করেন। স্বপ্ন দেখে রাজার নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে যায় এবং অতি প্রত্যুষে ভগবানের নির্দেশ অনুসারে সমুদ্রতীরে গিয়ে স্বপ্নে দেখা সেই অদ্ভুত বৃক্ষটি দেখেন। আদেশ অনুসারে তাকে সপ্তম ভাগে বিভক্ত করে মূল ভাগটি দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার প্রতিমূর্তি তৈরী করিয়ে স্থাপন করেন। যা বর্তমানে শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথ নামে পূজিত হন। ঐ বৃক্ষের উর্দ্ধভাগ দিয়ে কাশ্মীরে যে মূর্তি স্থাপিত হয় তা 'আদিত্য' নামে প্রসিদ্ধ। এক অংশ দিয়ে দেবগুরু শুক্রাচার্য্য প্রথমে 'শোনাদিত্য' নামে ভগবানের মূর্তি স্থাপন করেন এবং পরবর্তী সময়ে তিনি ঐ বিগ্রহের মূর্তিকে শিলামূর্তিতে পরিণত করে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন। বাকি অংশের দুটি ভাগ হতে বরুণদেব কামরূপের মলয়গিরি পর্বতে একটি ও মণিকূট পর্বতে ভগবানের মূর্তি স্থাপন করেন; যা 'হয়গ্রীব মাধব' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ঐ

বৃক্ষের শেষ অংশ দিয়ে কুবের দেব উত্তর লক্ষ্মীমপুর জেলায় 'নন্দীশ' নামে ভগবানের মূর্তি স্থাপন করেন, যা বর্তমানে 'মৎসাক্ষ মাধব' নামে পরিচিত। পুরাণে বিশেষতঃ 'যোগিনী তন্ত্রে' এই মূর্তি রহস্যটি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

'হয়গ্রীব মাধবের' মন্দিরের অভ্যন্তরের গর্ভগৃহে পাঁচটি মূর্তি স্থাপিত রয়েছে। হয়গ্রীব মাধব ও তাঁর একদিকে দ্বিতীয় মাধব ও গরুড়পাখী এবং অন্যদিকে গোবিন্দ মাধব ও বাসুদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। 'হয়গ্রীব' বিষ্ণুর অবতার। মহাভারত এবং বিভিন্ন পুরাণে এই অবতার রূপ গ্রহণের কাহিনী বর্ণিত রয়েছে। মহাভারতে বলা হয়েছে বিষ্ণু ভগবান মধু আর কৈটভ নামক দুই দৈত্যকে বধ করার পর 'বেদ' উদ্ধার করার জন্য 'হয়গ্রীব' রূপ ধারণ করেন। মৎস্যপুরাণ মতে মৎস্য অবতারের পূর্বেই তিনি 'হয়গ্রীব' অবতার রূপ ধারণ করেছিলেন, তবে দেবীভাগবত মতে বিষ্ণুর এই হয়গ্রীব রূপ ধারণের সম্পর্কে একটি সুন্দর কাহিনী বর্ণিত রয়েছে।

কোন এক সময় ভগবান বিষ্ণু দশ-হাজার বৎসর ধরে দৈত্যদের সঙ্গে দারুণ যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হয়ে কোন নির্জন স্থানে পদ্মাসনে বসে, আপন তীরধনুক ভূতলে স্থাপন করে ধনুকের অগ্রভাগ আপন কণ্ঠে স্থাপন করে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হয়ে যান। অন্যদিকে সেই সময় ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক যজ্ঞের আয়োজন করেন। কিন্তু যজ্ঞের হোতা বিষ্ণু দেবতাকে কোথাও না পেয়ে তাঁরা ধ্যান-যোগে তাঁর অবস্থান অবগত হয়ে ঐ নির্জন প্রদেশে ভগবান বিষ্ণুকে যোগনিদ্রায় অবচেতন দেখে নিজেদের মধ্যে বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করতে থাকেন। যজ্ঞের জন্য একদিকে যেমন বিষ্ণু ভগবানের উপস্থিতি প্রয়োজন; অন্যদিকে নিদ্রাভঙ্গ হলে যদি ভগবানের ক্রোধ উপস্থিত হয় তবে সকলের ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। এমত অবস্থায় পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা ধনুকের অগ্রভাগ ভঙ্গ করার জন্য 'বজ্রী' নামক এক কীটের সৃষ্টি করেন। ঐ কীট মৃত্তিকাস্থিত ধনুকের অগ্রভাগ ভক্ষণ করার সঙ্গে সঙ্গে ধনুকের জ্যা-বন্ধন মুক্ত হয়ে যায় এবং পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়। চতুর্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এমত অবস্থায় দেবতারা বিষ্ণুর মস্তকহীন কবন্ধমূর্তি দর্শন করে হায়-হায়কার করে ওঠেন। সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেবতাগণ সকলে একত্র হয়ে এর প্রতিকার বিধানের জন্য মহামায়ার ধ্যানে নিমগ্ন হন। কারণ মহামায়াই একমাত্র পারেন তাঁদের এই বিপদ হতে মুক্তি দিতে। দেবতারা ধ্যান ও নানা স্তব-স্তুতি দ্বারা দেবীকে তুষ্ট করেন। দেবী তাঁদের এর প্রতিবিধানের জন্য বিষ্ণুর শরীরে হয়ের (অশ্ব) মস্তক সংযোযন করার জন্য বিশ্বকর্মাকে আদেশ দেন, এর সঙ্গে তিনি আরও বলেন যে এরফলে দেবতাদের আরও একটি মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হবে।

ঐ সময়ে 'হয়গ্রীব' নামে এক দৈত্য সরস্বতী নদী তটে বসে অমর হবার বাসনায় কঠোর তপস্যায় রত হয়। তার সাধনায় দেবী তুষ্ট হয়ে তাকে দর্শন দিয়ে তার বাসনা শুনে বলেন যে; জন্ম হলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, অতএব তাকে অন্য বর প্রার্থনা করতে বলেন। দৈত্য তখন দেবীর নিকট এই বর প্রার্থনা করেন যে হয়গ্রীব ভিন্ন অন্য কোন দেবতা বা প্রাণী যেন তাকে বধ করতে না পারে। দেবী সেইমত বর প্রদান করে অন্তর্হিত হন। দেবীর বরে বলীয়ান হয়ে দৈত্য স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল সর্বত্র পীড়ন আরম্ভ করে। অন্যদিকে মহামায়ার অনুগ্রহে ভগবান বিষ্ণু তখন 'হয়গ্রীব মাধবে' পরিণত হন। পরবর্তী সময়ে মাধব প্রচণ্ড যুদ্ধ করে ঐ মদদর্পিত দৈত্যকে নিহত করেন। তদাবধি শ্রীবিষ্ণু 'হয়গ্রীব' নামে পূজিত হন।

সমস্ত মন্দিরটি তিনটি ভাগে বিভক্ত। একটি গর্ভগৃহ, যেখানে দেবতাদের পূজা-আরতি ও ভোগ ইত্যাদি হয়। মধ্যভাগ হতে দর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে এবং শিখর অঞ্চলটি অনেকটা পিরামিডের আকৃতির। সমগ্র মন্দিরটি ইঁটের তৈরী পিলারের উপর অবস্থান করছে, যা দেখলে অনুধাবন করা যায় যে পুরাতন মন্দিরটির উপর নবনির্মিত মন্দিরটি তৈরী করা হয়েছে। মন্দিরের কারুশিল্পও অতি চমৎকার। এর মধ্যে সুন্দর পদ্ম খোদাই করা রয়েছে আর বহির্দেশে রয়েছে দশ অবতারের মূর্তি। এই মূর্তিগুলির মধ্যে নবম অবতার রূপে ভগবান বুদ্ধের মূর্তি স্থাপিত রয়েছে। এতদ্ব্যতীত হয়গ্রীব মাধবের মন্দিরের প্রাচীরের অভ্যন্তরে একটি দোলন মন্দিরও রয়েছে। এই মন্দিরটি ১৭৫০ খৃঃ অহোম রাজ প্রমত্ত সিংহ স্থাপন করেছিলেন। এখানে প্রতি বৎসর দোল উৎসব বিশালাকারে পালিত হয়।

হয়গ্রীব মাধবের উপর হাজোবাসীর অটল বিশ্বাস রয়েছে। বিপদ-আপদ বা অমঙ্গল এলে হাজোবাসী মানুষেরা বলেন যে তাদের হাজোতে মাধব রয়েছেন, তাদের কোন ভয় নেই। তাই হাজোবাসীরা একত্রে জয়ধ্বনি দেয় ''হয়গ্রীব মাধৌ কি জয়''।

—মাতৃচরণাশ্রিতা স্বাধ্বী অনুভানন্দময়ী

আশ্রম সংবাদ

১৫ই এপ্রিল— বাংলা ১৪২৫-এর নববর্ষের সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমাকে দর্শনের অভিলাষে বহু ভক্ত সমাগত হয়েছিলেন।

সৎসঙ্গে শ্রীশ্রীমা সাধনার কথা প্রবচন করেন।

২৯শে এপ্রিল — বুদ্ধ পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীমা ক্রিয়াযোগ সাধন সম্বন্ধীয় শিক্ষণীয় কিছু উপদেশ দেন। প্রতিবারের মত আধ্যাত্মিক প্রশ্নোত্তরী পরিচালনা করেন গুরুভ্রাতা ডাঃ বরুণ দত্ত।

৩০শে এপ্রিল — শ্রীশ্রীমা কয়েকজন ভক্ত সহিত কোন্নগরে অবস্থিত শ্রীমাধবানন্দের আশ্রমে গিয়েছিলেন।

৯ই মে এইদিন পরমহংস যোগানন্দের ধারার সন্ন্যাসী স্বামী চেতনানন্দ গিরি মহারাজজী শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনে আসেন। আশ্রমে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ এই সৎসঙ্গের সৌভাগ্য লাভ করেন।

১৭ই জুন — এইদিন সন্ধ্যায় আধ্যাত্মিক সভার ২৭ তম পর্বে ৭ম কঠোপনিষদ্ প্রসঙ্গ ব্যাখ্যাত হয়। কঠোপনিষদ্ সম্বন্ধে বললেন শ্রীশ্রীমায়ের সন্তান ডাঃ বরুণ দত্ত। পরবর্তী কঠোপনিষদ্ প্রসঙ্গ আলোচিত হবে ৩০শে সেপ্টেম্বর।

২৮শে জুন — শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার পুণ্য তিথিতে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব তিথি পালিত হয়। সকালে ঁশ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা অন্নক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয় শ্রীশ্রী গুরুপূজা। দ্বিপ্রহরে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় আশ্রম মন্দিরে একটি ভজনের অনুষ্ঠান হয়। পরিশেষে শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা চট্টোপাধ্যায় সুন্দর ভক্তিমূলক গান পরিবেশন করেন।

হমें अपार वेदना एवं दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी प्रिय गुरुबहिन श्रीमती सुषमा छाजेड़ १ जून को अकाल काल कवलित हो गई। बहुत वर्षों से आश्रम के सभी क्रियाकलापों में सुषमा का हार्दिक योगदान था। परमपिता परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे।

आश्रम समाचार

१५ अप्रैल –बंगाब्द १४२५ की सूचना के शुभसंध्या पर श्रीश्रीमाँ के दर्शन के अभिलाषी अनेक भक्तों का समागम हुआ। सायंकाल में सत्संग में श्रीश्रीमाँ ने साधना के अमूल्य विषय पर प्रकाश डाला।

२९ अप्रैल – बुद्ध पूर्णिमा की पुण्य तिथि पर श्रीश्रीबाबाजी महाराज का श्रीविग्रह प्रतिष्ठा दिवस मनाया गया। संध्या में आश्रम में श्रीश्रीमाँ ने क्रियायोग साधन संबंधी अत्यंत शिक्षणीय कुछ वक्तव्य पेश किए। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी का परिचालन गुरुभ्राता डा: श्रीवरुण दत्त ने किया।

३० अप्रैल – श्रीश्रीमाँ कुछेक भक्तों के साथ कोन्नगर में अवस्थित श्रीमाधवानंद के आश्रम में पधारीं थी।

९ मई – इसदिन परमहंस योगानन्दजी की धारा के एक सन्यासी स्वामी चेतनानंद गिरि महाराजजी श्रीश्रीमाँ के दर्शन हेतु आश्रम में आये थे। आश्रम में उपस्थित् भक्तवृन्दों ने इस सत्संग का सौभाग्य प्राप्त किया।

१७ जून – इस संध्या आध्यात्मिक सभा के २७वें पर्व पर ७ वा 'कठोपनिषद् प्रसंग' आलोचित हुआ। कठोपनिषद् प्रसंग पर तात्त्विक वक्तव्य प्रस्तुत किया डा: वरुण दत्त ने। कठोपनिषद् प्रसंग की परवर्ती समालोचना ३० सितम्बर को होगी।

२८ जून –श्रीश्रीजगन्नाथ देव की स्नानयात्रा के दिन श्रीश्रीमाँ की आविर्भाव तिथि मनायी गई। श्रीश्रीअन्नपूर्णा अन्नक्षेत्र में अनुष्ठित हुई श्रीश्रीगुरुपूजा एवं नारायण पूजा। दोपहर में भक्तवृन्दों ने प्रसाद ग्रहण किया। संध्या में आश्रम मन्दिर में भजनों का मनोहर अनुष्ठान हुआ। अन्तिम में श्रीमती प्रियंका चट्टोपाध्याय ने सुन्दर भक्तिमूलक संगीत का परिवेशन किया।

श्रीश्री सूर्य-नारायण

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

प्राचीन आर्य ऋषियों के अन्यतम प्रधान उपास्य देवता थे 'सूर्य'। आर्यजाति की विभिन्न शाखा-प्रशाखाओं में इनकी उपासना का प्रचलन था। जैसे, ये ग्रीक में Helios, लैटिन में Sol, टियुटन में Tyr एवं इरान में 'खुरसेद' नाम से जाने जाते थे। सूर्यदेव के संबंध में अनेक ऋषियों ने बहुत से ऋक्मन्त्रों की रचना की है। सूर्य, सविता, आदित्य, विवस्वान, विष्णु - इन पाँच विभिन्न नामों से सूर्य की स्तुति की जाती है। विभिन्न समय में और महिमा द्वारा इस प्रकार के भिन्न-भिन्न नामों से सूर्य को चिह्नित किया गया था। जास्क के मतानुसार, आकाश से जब अंधकार अपसारित होता है तब किरण विस्तृत होती है, वही समय हुआ सविता का काल। सायन के अनुसार, सूर्य उदय के पूर्व में जो मूर्ति दृश्यमान होती है वही सविता और उदय से अस्त पर्यन्त जो मूर्ति परिलक्षित होती है, वही सूर्य है। ('सविता' का तात्पर्य है देवताओं की प्रसविता; समस्त भूतों एवं समस्त भावों की जन्मदाता है इसीलिए 'सविता'।) इस सूर्य का उदयगिरि में आरोहण, मध्यगगन में स्थिति - एवं अस्ताचल में अस्तगमन, ये तीन अवस्थाएं विष्णु के पद-विक्षेप कहकर वर्णित हुई है। 'विवस्वान' सूर्य का और एक नाम है। 'विवस्वान' शब्द से आकाश को जाना जाता है। ये उदीयमान सूर्य; ये ही वेद के प्रथम यज्ञकर्ता है। अहोरात्र विभाग के कर्ता है अर्यमा; ये मित्र और वरुण के (दिवा और रात्रि) के मध्यवर्ती देवता कहकर परिचित है।

श्रीश्री सूर्य-नारायण

ऋग्वेद के १० सूक्त में सूर्य की स्तुति है। ऋग्वेद में सूर्य ही इन्द्र, मित्र, वरुण और अग्नि है। यह सूर्य जड़ ज्योति पिण्ड नहीं है, यह सूर्यमण्डल मध्यवर्ती देवता जो ब्रह्मपुरुष है। वेदों में अग्नि के सदृश सूर्य को भी सर्वत्र एक ही प्रकार से उल्लेख किया गया है कारण अग्नि ही सूर्य है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता, साक्षात् विष्णु स्वरूप। सूर्य ही जगत् की आत्मा है, महान आत्मा कहकर परिचित होते हैं। आलोक उद्भासित आकाश इनका मुख, सूर्यमण्डल इनके चक्षु; ये हिरण्यपाणि, सर्वदर्शी विश्वभुवन के चर, मर्त्यजनों के सत् और असत् कर्मों के साक्षी हैं। सप्ताश्वयोजित एक चक्र के रथ पर वे विश्व पर्यटन करते है। (सूर्य रथ में एक चक्र और तीन नाभि है। सूर्य का सप्तअश्व रथ बहुत प्रसिद्ध है। सायन के अनुसार इस सप्तअश्व का अर्थ है वायु के सात रूप या सप्तरश्मि या छः ऋतु और एक अधिमास। तीन नाभि का अर्थ है ग्रीष्म, वर्षा, हेमन्त अथवा भूत-भविष्यत्-वर्तमान काल। एक चक्के का तात्पर्य है एक वर्ष या हंस का एक पाद। इस प्रकार सूर्य रथ से संबंधित अनेक व्याख्याएं की गई हैं।) वरुण इनका पथ परिष्कार कर देते हैं। सूर्य शक्ति मनुष्यों को कर्म की ओर प्रवर्तित या जाग्रत करती है। स्थावर और जंगम समस्त पदार्थों के ये प्राणस्वरूप हैं। समग्र प्राणी इनके अधीन, ये विश्व स्रष्टा हैं। सूर्य की माता द्यौः या अदिति। विधाता ने सूर्य और चन्द्रमा की अपनी चिन्मय कल्पना द्वारा सृष्टि की है। अश्विद्वय सूर्य के पुत्र है। ऊषा सूर्य की जनयित्री; सूर्य ने प्रणयी के सदृश इस सुन्दरी देवी का अनुगमन किया। सूर्य ऊषा की क्रोड़ में दीप्ति पाते हैं, फिर ऊषा इनकी स्त्री भी है। सूर्य विराट् पुरुष के चक्षु से उत्पन्न हुए हैं। ये आकाश में पक्षी के सदृश या उज्ज्वल अश्व के सदृश विचरण करते रहते है। ये आकाश के परमरत्न, उज्ज्वल अस्त्र, रथ के चक्र है। मित्रावरुण इन्हें मेघ और वृष्टि द्वारा आवृत करते हैं। इन्द्र सूर्य को पराजित कर उनके रथचक्र का हरण कर लेते है, अर्थात् मेघ से सूर्यमण्डल आवृत हो पड़ता है। स्वर्भानु राक्षस अंधकार द्वारा सूर्य को आच्छादित कर लेते है; महर्षि अत्रि सूर्य को मुक्त कर पुनः आलोक में प्रतिष्ठित करते है। अथर्व वेद में राहु का उल्लेख प्रथम मिलता है। राहु लोकहितकर साधक ग्रह में अन्यतम है। सूर्य समय के सृष्टिकर्ता है। ये ३६० दिन में संवत्सर का गठन करते हैं। सूर्यचक्र में १२ अरा या मास है। वह आकाश में ७२० बार (३६० दिन और ३६० रात्रि) में आवर्तित होते है। अथर्व वेद और आरण्यक में सप्त सूर्य का उल्लेख है। यह ऋग्वेद का सप्ताश्व और सप्तरश्मि।

कुर्म पुराण में वर्णित है, प्रकृति प्रसूत अण्ड से भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक उत्पन्न हुए है। सूर्य और चन्द्रमा की रश्मियाँ जितनी दूर पर्यन्त विस्तृत होती है उतनी दूर पर्यन्त भूलोक कहकर कथित है। भूमि से लक्षयोजन ऊर्ध्व में सौर्यमण्डल का अवस्थान है और उसके लक्षयोजन ऊर्ध्व में चन्द्रमण्डल अवस्थित है। सविता का व्यास ९ (नौ) सहस्र योजन एवं उसके मण्डल की परिधि उससे तीन गुणा है। सूर्य के ७ अश्व है; यथा गायत्री, वृहती, उष्णीक, जगती, पंक्ति, अनुष्टुप और त्रिष्टुप।

सूर्य का और एक अन्य नाम 'आदित्य', तथापि अनेक जगहों पर आदित्य से सूर्य की पृथक कल्पना की जाती है। प्रधानतः अर्यमा, मित्र, वरुण, धाता, भग, विवस्वान, पूषा, त्वष्टा, विष्णु, अंश, सविता और शक्र आदित्य के इन १२ नामों का वर्णन मिलता है। सूर्य क्रमान्वय वसन्तादि ऋतु में इन द्वादश आदित्य को आश्रय करते है। पुलस्त्य, पुलह, अत्रि, वशिष्ट, अंगिरा, भृगु, भरद्वाज, गौतम, कश्यप, क्रतु, जमदाग्नि और कौशिक ये द्वादश ब्रह्मवादी ऋषियों ने पवित्र वेदमन्त्र द्वारा द्वादश आदित्यों का स्तव किया था। प्रतिवर्ष उत्तर और दक्षिण के मध्य आरोहण और अवरोहण द्वारा एकशत अशीति मण्डल द्वारा सूर्य का जो गन्तव्य पथ है, उसी पथ पर सूर्य रथ गमन करता है, उससे प्रतिमास भिन्न-भिन्न आदित्य देवगण विष्णु तेज से वर्द्धित होकर ऋषिगण, गन्धर्व, अप्सरा, यक्ष, नाग और राक्षसगण अधिष्ठान करते है। रथकृत, प्रहेति, मित्र, वरुण, वशिष्ठादि प्रभृति ग्रामीणगण रथाक्रम सूर्य रश्मि को संयम करते है। हेति (अप, वात) प्रभृति राक्षसगण सूर्य के पश्चात् में गमन करते है। वासुकी प्रभृति नागगण रथ के अलंकार रूप में विराजमान रहकर द्वादश आदित्य को वहन करते है। तम्बुरु प्रभृति गन्धर्वगण आदित्य के द्वादश गायक। ऋतुस्थला (अनुम्लोचा) प्रभृति अप्सराएं नृत्यगीत द्वारा सूर्य को परितुष्ट करती है। यक्षगण रथ के अश्वरज्जु को धारण करते हैं एवं बालखिल्य मुनिगण रथ को वेष्टन कर अवस्थान करते है।

ऋक्, साम और यजुर्वेद के निदान स्वरूप पंचकाल के ईश्वर प्रजापति देव दिवाकर ब्रह्मा के पुत्र है। वे दिवस मास और ऋतु प्रवर्त्तयिता एवं सभीजनों के पितामह स्वरूप है। इन्हीं देव भास्कर से काल-विभाग, मास, ऋतु, अयन, ग्रह-नक्षत्र, आयु कल्पित होती है। वे ही भूतगणों के उत्पत्ति और विनाश के साधक होकर भास्कर रूप में कीर्तित होते है। परवर्ती युग में देखा जाता है देव विवस्वान सूर्य महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र थे। वे प्रथमतः एक अण्डाकार रूप में प्रसूत हुए। दीर्घकाल पर्यन्त भी जब वह अण्ड स्फुटित नहीं हुआ तो यह देखकर विश्वकर्मा (त्वष्टा) ने उसे विदारित किया। पिता कश्यप ने इससे अतिशय दुःखित होकर स्नेहवशतः कहा, ''यह अण्ड मृत नहीं है।'' इसीलिए विवस्वान तब से 'मार्तण्ड' नाम से कीर्तित हुए। उनके पुत्र ही 'वैवस्वत मनु'(ये वैवस्वत मनु ही इक्ष्वाकु के पिता; इक्ष्वाकु सूर्यवंश के प्रवर्तक) हुए थे। रामायण और महाभारत के मतानुसार, सूर्यदेव कश्यप और अदिति के पुत्र थे। इसी कारण से इनका अन्य नाम हुआ 'आदित्य'। विश्वकर्मा की कन्या संज्ञा के साथ सूर्य का विवाह हुआ एवं संज्ञा के गर्भ से वैवस्वत मनु, यम और यमुना नाम की तीन संतानें हुई। सूर्य के प्रखर तेज और द्युति सहन न करने के कारण संज्ञा ने स्वानुरूपा छाया की सृष्टि की एवं स्वामी की संगिनी रूप में उनके निकट प्रेरण कर उत्तर कुरुवर्ष में अश्वारूप धारणपूर्वक भ्रमण करती रहती। छाया के सूर्य की परिचर्या में रत रहने पर छाया को संज्ञा मानकर सूर्य ने उनके गर्भ से दो पुत्रों और एक कन्या को जन्म दिया। ज्येष्ठ सावर्णि मनु, द्वितीय शनि और कन्या तपती। (चंद्रवंशी संवरण के साथ तपती का विवाह सम्पन्न हुआ।) बाद में संज्ञा की शठता समझकर सूर्य अश्वरूप धारण कर उत्तर कुरु में जाकर संज्ञा के साथ जा मिले। फलस्वरूप अश्विनी कुमारद्वय का जन्म हुआ। अतएव सूर्यदेव संज्ञा को सूर्यलोक में पुनः ले गये। विश्वकर्मा ने सूर्य के उग्रतेज को ह्रासित करने के लिए उनकी देह को अष्टम अंश में विभक्त कर दिया। ये विभक्त अंश ज्वलन्त अवस्था में पृथ्वी पर पतित होने पर तब विश्वकर्मा ने उस ज्वलन्त अंशद्वारा विष्णु का चक्र, शिव का त्रिशूल, कुबेर का अस्त्र, कार्तिकेय की तलवार और अन्यान्य देवताओं के अस्त्र प्रस्तुत किए।

देव सविता प्रत्यह उदय और अस्तगमन काल में सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते। यह देखकर विन्ध्यगिरि ने ईर्ष्यावश सूर्य से कहा, ''तुम प्रत्यह जिस प्रकार सुमेरु की प्रदक्षिणा करते हो उसी प्रकार मेरी प्रदक्षिणा करो।'' सूर्यदेव ने कहा कि वे स्वेच्छा से सुमेरु की प्रदक्षिणा नहीं करते, विश्वस्रष्टा द्वारा आदिष्ट पथ पर ही उन्हें भ्रमण करना पड़ता है। विन्ध्याचल सूर्य के इस कथन पर क्रोधान्वित होकर उसकी गतिरुद्ध करने के लिए अपने मस्तक को उन्नीत कर उत्थित हो गये। विन्ध्यगिरि को इस प्रकार 'रवि' का पथावरोध

करते हुए देखकर देवगण उत्कंठित हुए एवं सर्व प्रथम अनेक प्रकार के स्तुति वाक्यों द्वारा विन्ध्य को प्रसन्न करने की चेष्टा की। इसमें अकृतकार्य होकर देवगण अवशेष में महर्षि अगस्त्य के शरणापन्न हुए। देवगण की प्रार्थना से अगस्त्य महर्षि ने कौशल से विन्ध्यगिरि को नतशिर किया।

दिनपति सूर्यदेव यज्ञ के दक्षिणा स्वरूप दक्षिण की ओर अपने गुरु महर्षि कश्यप को प्रदान किया। पूर्व की ओर सविता, देवी सावित्री के मुख से उत्पन्न होकर ब्रह्मवादियों का आश्रय लेती है। इस ओर ही भास्कर ने महर्षि याज्ञवल्क्य को समग्र यजुर्वेद प्रदान किया था। सूर्य देव दक्षिण की ओर गमन कर सुरस जल समस्त का क्षय कर देते हैं। एवं वे पुनराय उत्तर की ओर गमन कर हिम वर्षण करवा देते हैं। दक्षिण की ओर 'चक्रधनु' नाम के एक महर्षि ने भास्कर से जन्मग्रहण किया। ये चक्रधनु ही 'कपिलदेव' के नाम से विख्यात हुए।

जगत् के प्राणज्योति दिवाकर सूर्यदेव नवग्रहों में अन्यतम है। इसके अतिरिक्त सूर्य और चन्द्रमण्डल ग्रह कहकर कथित होते हैं। सूर्य ग्रहराजरूप से परिचित हैं। इसीलिए नवग्रह स्तव में सूर्य को ही प्रथम नमस्कार निवेदित किया जाता है। महर्षि कश्यप तनय सूर्य अग्नि और शिवरूप में भी कीर्तित है। सूर्य के पुत्र हैं शनि। सृष्टि रक्षार्थ स्रष्टा के नियमानुसार सूर्य समस्त ग्रहों के निम्न में विचरण करते हैं। परन्तु इनका देवलोक सर्वोच्च स्तर पर अवस्थित है। सूर्य के ऊपर सोम (चन्द्र), तदुपरांत नक्षत्रमण्डल विराजित है। सूर्य का विस्तार नौ सहस्र योजन एवं सौर-मण्डल का विस्तार और भी तीनगुणा अधिक। वे भव्यलोक के अधिपति कहकर कीर्तित होते हैं। इस सृष्टि में सूर्यदेव एक लोकपाल है। सूर्य रव के देवता इसीलिए रवि नाम से अभिहित है। मार्कण्डेय पुराण में सूर्य को ॐ (ओंकार) बोला गया है। विष्णुपुराण में हैं कि रात्रिकाल में सूर्य की प्रभा अग्नि में चली जाती है और दिवस काल में अग्नि का चतुर्थांश सूर्य में आ जाता है; फलस्वरूप सूर्य प्रखर हो उठता है। विष्णु शक्ति के प्रभाव से ही अहोरात्र के कारणरूप में सूर्य परिवर्तित होता है।

विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ने लिखा है –''आनन्दधारा बह रही भुवन में, कितना अमृतरस उद्वेलित हो रहा अनन्त गगन में। पान कर रहे रवि-शशि अंजलि भर कर, सदा दीप्त रहे अक्षय ज्योति।''

हमारी देह के अभ्यंतर में मस्तक के सहस्रार में सोममण्डल एवं नाभि केन्द्र में मणिपुर ब्रह्मचक्र में विष्णुनाभी की तेजअग्नि द्वारा संजीवित सूर्यमण्डल अवस्थित है। सोम-मण्डल से अमृतरस बिन्दु पतित होकर नाभि में सूर्यकुण्ड में आकर गिरने से सूर्य की अग्निमय तेज से ओजः धातु में परिणत होकर समग्र देह में विस्तार प्राप्त कर योगी की देह को ओजस्वी कर देते है। यौगिक भाषा में इसे 'हठ' कहा जाता है, यह 'हठ' अवस्था प्राप्त होने पर योगी की सत्ता में अमृत का संचार होता है। सूर्य और चन्द्र की समरस्यता से यह समग्र सृष्टि की धारा संचालित होती है। मानव ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करे या ना करे गगन में उद्भासित अम्लान ज्योतिरूपी सूर्य को या सूर्यदेवता को समस्त जन स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। –

''तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञान-विज्ञान मोक्षदम्।
तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजः प्रदीपनम्।
तं सूर्यं प्रणामाम्यहम्।।''

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

दिव्यतेजाग्नि

अंतरिक्ष में विराजित हैं प्रकाशमान भास्कर
त्रिजगत् के प्राणपति निखिल वैश्वानर
सर्व सृष्टि के परम कारण, सर्व शक्ति प्रदाता
सर्व कलुष नाशक, सर्व प्राणी के विधाता
प्रणाम तुम्हें आदित्यदेव, भौतिक-यज्ञ प्रणेता।

अग्निरूप रवि-शक्ति प्रकाशित धरातल में
असीम तेज प्रत्यक्ष है सर्व कण-कण में
वेद-विहित कर्मों का एकाधिपति होकर
स्वीकारते आदर से आहुति 'स्वाहा' मंत्र पर
प्रणाम तुम्हें पूत-पावक, ज्ञान-यज्ञ प्रदाता।

मानव-सत्ता में तेजरूप का निवास मणिपुर में
प्राणायाम की आहुति से जाग उठे हृद्स्थल में
अंतरिक्ष का संयोग रवि-किरण के माध्यम
विश्व-प्राण की चेतन-वीणा गूंज उठे हरदम।
प्रणाम तुम्हें हे आदिदेव, आत्म-यज्ञ नियन्ता।

–मातृचरणाश्रिता श्रीमती केया चक्रवर्त्ती

श्रीश्रीमाँ की प्रथम बद्रीनाथधाम यात्रा

(९)

प्राचीन काल से ही बद्रीनाथधाम को व्यासतीर्थ कहा जाता है क्योंकि कृष्णद्वैपायन ऋषि वेद को विभक्त कर वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने वेदानुसार ही अपने विभिन्न पुराण ग्रंथों की रचना की। अति प्राचीन तीर्थस्थान एवं देवभूमि बद्रीनाथ धाम ही था भारत ऋषि-महात्मा व्यासदेव की तपस्यास्थली। मानाग्राम के पथ पर आगे बढ़ने पर सर्वप्रथम मिलती है व्यासदेव की गुहा। श्रीनारायणक्षेत्र में उसी गुहा में बैठकर उन्होंने दीर्घकाल तपस्या की थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के प्राय: ३६ वर्ष बाद जब यदुवंश का विनाश हुआ और श्रीकृष्ण-बलराम अपनी लीला संवरण कर अंतर्हित हुए, उसी समय महात्मा व्यासदेव के उपदेश से पंच-पांडवगण द्रौपदी को साथ लेकर चल पड़े उसी महाप्रस्थान के पथ पर।

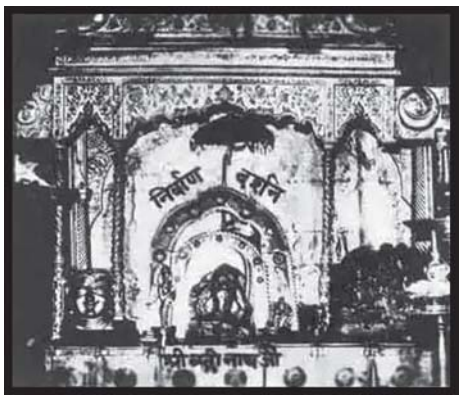

श्रीश्री बद्रीनाथ

हमलोगों के प्रस्थान का समय नज़दीक आरहा था। चिर तुषारावृत हिमगिरि क्षेत्र के महापुण्यशाली तीर्थस्थान बद्रीनाथधाम से हरिद्वार आगमन के कार्यक्रम की तिथि निश्चित हुई थी २०-९-२०१२ को। सितम्बर मास ही था शीत का प्रात:कालीन परिवेश। हम सभी एकत्रित होकर श्रीश्रीमाँ को संग लेकर होटल से बाहर आकर, पथ में खड़े होकर नीलकंठ पर्वत के शिखर के रंग-बिरंगे रंगों का शोभामय सौन्दर्य देख रहे थे। ऊषाकाल के झिलमिल प्रकाश में श्रीश्रीमाँ प्रत्येक पर्वत के मनोरम दृश्य का अनुपम सौन्दर्य निहार रही थी। इधर गुरुभ्राता पार्थदा अपने गले में चित्रसंग्राहक (कैमरा) लटका कर एक तरफ तस्वीर खींच रहे थे और एक तरफ बार-बार रावलजी को दूर-संचार (फोन) से बुला रहे थे। उनसे अनुरोध कर रहे थे मंदिर से श्रीश्रीमाँ के निर्देशानुसार प्रयोजनीय पूजा की सामग्री लाने हेतु ताकि हमलोगों की यात्रा आरम्भ में विलंब न हो जाए। चालक और हमारे सन्यासी गुरुभाई प्रबोधानंदजी सभी सामानों को गाड़ी पर अच्छी तरह बाँधकर रखने में व्यस्त थे। वहाँ किसी राजनीतिक दल द्वारा उस दिन पहाड़ बंदी का आह्वान किया गया था। इसीलिए सुबह से कोई दुकान नहीं खुली थी। चाय पीने के लिए व्यस्त तो ज़रूर थे हमलोग परन्तु हमलोगों की वार्ता सुनकर गाड़ी चालक ने कहा कि उसने कई रास्तों में जाकर देखा कि एक भी दुकान खुली नहीं थी। यह सुनकर ही चाय पीने का नशा फुर्र हो गया। श्रीश्रीमाँ तत्क्षण गाड़ी में आ बैठी थी, इसी समय रावलजी आकर श्रीश्रीमाँ के प्रयोजनानुसार श्रीश्रीबद्रीनाथजी के पूजाकाल की समग्र सामग्रियाँ अति यत्न के साथ दे गए एवं दक्षिणा पाकर खुश होकर श्रीश्रीमाँ एवं हमसबों को प्रणाम कर विदाई लेते ही हम सबों की गाड़ी चल पड़ी। अक्षयधाम एवं मोक्षधाम के देवता श्रीश्रीबद्रीनाथजी को हाथ जोड़ कर प्रणाम किया एवं मुँह से जय जयजयकार किया, 'जय बद्रीविशालजी की जय'। अपार कृपा प्रदानकारी भगवान श्रीविष्णुजी के चिरस्थायी अवस्थान-क्षेत्र का त्याग करते ही मन आनंदहीन हो गया। गाड़ी उतराई के रास्ते पर चल रही थी। दोनों तरफ पर्वतशृंग और उनके बीच बह रही थी पुण्यतमा नदी श्वेतगंगा स्वर्गगंगा अलकानंदा, मर्त्यलोक में अवतरण हेतु अपनी धुन में। मानों कवि के गीत की भाषा में- 'नदी अपने वेग में पागलों की तरह,' हमने काफी दूर आगे निकलने पर देखा कि रास्ते पर दोनों तरफ कतार में गाड़ियाँ खड़ी थी। खराब मौसम एवं वृष्टि से पहाड़ के सटे रास्ते के धँस जाने से आने-जाने का पथ बहुत संकीर्ण हो गया था। इसलिए पहाड़ पर कार्यरत सेनावाहिनी जल्दी-जल्दी बगल के पहाड़ को डाइनामाइट से विस्फोट कर संकीर्ण पथ को प्रशस्त करने का प्रयास कर रही थी, जिससे हमलोग कुछ देर के लिए अटक गये। कुछ ही देर के बाद मार्ग के अवरोधहीन हो जाने पर हमारी गाड़ी चलने लगी। चलती हुई गाड़ी पर बैठे हुए श्रीश्रीमाँ ने पांडुकेश्वर में रहने वाले स्वामी नारायणगिरि

नामक एक साधुबाबा के संबंध में जानकारी दी, एवं वहाँ गाड़ी रोककर साधुबाबा के आश्रम का पता लगाने को कहा। साधुबाबा का एक शिष्य वहाँ का डाक-प्रधान था। उससे सारी जानकारी मिल जाएगी, श्रीश्रीमाँ ने यह बात भी हमें बतायी थी। इसीलिए पांडुकेश्वर आते ही गुरुभाई पार्थदा उतरकर डाक-प्रधान तथा स्वामी नारायणगिरि महाराज का आश्रम का पथ-निर्देश जानने हेतु आगे बढ़े।

पार्थदा ने कुछ ही क्षणों में आकर श्रीश्रीमाँ को बताया कि स्वामीजी आश्रम में ही है। पर कुछ दिन पूर्व उनके शरीर पर किसी बड़ी बीमारी के आक्रमण से देह का एक भाग पक्षाघात से पीड़ित है, जिसके फलस्वरूप सभी प्रकार की सेवाएँ उन्हें शिष्यों के हाथ से ग्रहण करनी पड़ती है एवं जहाँ उनका गुहा-आश्रम है वह अति दुर्गम स्थान है। पार्थदा ने वार्ता जारी रखते हुए कहा कि वे दो अन्य गुरुभाई वरुणदा व प्रबोधानंदजी को साथ लेकर आश्रम जाने के मार्ग की अवस्था देखकर हमलोगों को दूरभाष द्वारा इसकी सूचना देंगे। स्वर्गगंगा अलकानंदा के तट पर श्रीश्रीमाँ, मैं और गाड़ी-चालक गाड़ी में बैठकर उनके संदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी समय पार्थदा ने गाड़ी चालक को दूरभाष द्वारा बताया कि वे लोग साधुबाबा के पास पहुँच गये हैं। चालक ने तब बात करने हेतु अपना फोन श्रीश्रीमाँ को दिया, उधर से पार्थदा कह रहे थे, उन्होंने महाराजजी से श्रीश्रीमाँ के संबंध में बहुत कुछ बताया है। महाराज ने सेवक से कहकर उन्हें बैठने की व्यवस्था की एवं खाने के लिए चाय, बिस्कुट प्रदान किया किन्तु, इस भंगुर पहाड़ी पथ पर चलकर आना श्रीश्रीमाँ के लिए असंभव होगा, इसकी भी जानकारी उन्होंने दी। इन सारे उपदेशमूलक बातों को सुनने के पश्चात् श्रीश्रीमाँ ने असंतुष्ट स्वर में पार्थदा से कहा, ''तुमलोग जब वहाँ चलकर पहुँच गये तो क्या मैं नहीं जा सकती? तुमलोगों ने कितने जन्मों तक पहाड़ी में रहकर साधना की है तथा मैंने कितने जन्मों तक गिरिवास कर साधना की है यह क्या तुम जानते हो? तुमलोग वहीं रुको मैं संवेदानंद को लेकर आ रही हूँ।'' यह सब सुनकर मेरा हृदय धड़कने लगा एवं ''जय गुरु, जय गुरु'' बोलने लगा, उसी समय मैंने देखा माँ ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया है। मैं श्रीश्रीमाँ को लेकर उस दुर्गम पहाड़ी पर निर्मित पगडंडी की तरह पतले सीढ़ी-नुमा रास्ते पर उतरने लगा जिससे होकर एक साथ दो व्यक्ति नहीं चल सकते थे। प्रबल असुविधायुक्त पथ पर श्रीश्रीमाँ ने मुझे आदेश दिया, ''मुझे पकड़ना नहीं होगा, तुम अपनी लुंगी संभालते हुए धीरे-धीरे उतरो, मैं स्वयं उतर जाऊँगी, चिंता मत करो।'' एक तो श्रीश्रीमाँ का भारी शरीर और इधर सीढ़ी के बगल में पकड़ने के लिए रेलिंग भी नहीं, यह सब देखकर मेरी अंतरात्मा काँप उठी। श्रीश्रीमाँ को देखकर ऊपर खड़े गाड़ी-चालक की अवस्था भी ठीक मेरी ही तरह थी, परन्तु यह दृश्य तो दर्शनीय था। धीर-स्थिर अवस्थायुक्त 'श्रीश्री देवी दुर्गा माता' मानों पर्वत से आरोहण कर रही हैं अपने सिद्ध-महात्मा संतान के अंतर की पुकार सुनकर, उनके आश्रम में उपस्थित होने हेतु। हिमालय के आँचल में अलकानंदा के तटपर के वे अपूर्व दृश्य मेरे स्मृति में हमेशा वर्तमान रहेंगे। हिमालय के ऊँचे पहाड़ी पथ से होकर देवी का आगमन (श्रीश्रीमाँ की) जब अलकनंदा की धारा के समीप हुआ तब हठात् मैंने देखा पार्थदा श्रीश्रीमाँ के पास डाँट खाकर सन्यासी गुरुभाई प्रबोधानंदजी को भेजकर, स्वयं पैदल पीछे-पीछे आ रहे हैं। तबतक हमलोगों ने काफी दूरी तय करली थी। उसके बाद उबड़-खाबड़ पहाड़ से सटा हुआ समतल पथ, तथा पहाड़ भेद कर झरने की स्वच्छ जल की धारा उस पथ के ऊपर बह रही है। उस जलधारा को सावधानी पूर्वक पार कर हमलोग आ पहुँचे स्वामी नारायणगिरि महाराज के गुहा के भीतर अवस्थित आश्रम में। स्वामी नारायणगिरि महाराज एक सिद्ध-महात्मा हैं, उनका जन्मस्थान नेपाल में हैं एवं उनके गुरुमहाराज थे सोमवारी बाबा। स्वामीजी की उम्र समय लगभग १०७ वर्ष थी एवं उन्होंने प्रायः ५० वर्षों तक पांडुकेश्वर में स्वर्गगंगा अलकानंदा के तट पर गिरि-गुहा में साधना की थी। स्वामी नारायणगिरि के गुहा के निकट अलकनंदा के तट पर पत्थर के टूकड़ों से सुसज्जित ऊँची वेदी के ऊपर बिछावन पर बैठे महात्माजी के पास जाकर माँ के खड़े होते ही, उन्होंने माँ को प्रणाम निवेदित किया तथा माँ जगदम्बा की उपस्थिति के आनंद से उसके नयन अश्रुप्लावित हो गये। मैंने भी महात्मा जी को प्रणाम किया, तब उन्होंने इशारा से बैठने को कहा। साधुबाबा का सौम्यकान्ति अत्युज्ज्वल चेहरा, जटायुक्त मस्तक पर पश्मीना की टोपी धारण किए, एवं मुखमंडल शुभ्र दाढ़ी एवं मूंछ से ढंका हुआ था। उनके बैठने के स्थान पर थोड़ी धूप तथा पेड़ की छाया थी जहाँ वे कंबल के भीतर

पाँव ढककर बैठे थे। माँ अपनी जीवन कथा का जो वर्णन स्वामी नारायणगिरि को सुना रही थी, वह सब मैं साधुबाबा के पैरों के पास बैठकर सुन रहा था। श्रीश्रीमाँ के सन्यासी शिष्यों (हमलोग) को देखकर स्वामी जी के मन में कुछ प्रश्न उठ रहे थे, फलस्वरूप श्रीश्रीमाँ ने अपने गुरुमहाराज अर्थात् हमलोगों के श्रीश्रीबाबा के संबंध में बताया जिन्होंने हिमालय के व्यासपीठ पर अवस्थित अपने गुरुमहाराज श्रीश्रीनांगाबाबा से २८ वर्षों तक हठयोग साधना में सिद्ध होकर, स्वामी सच्चिदानंद परमहंस उपाधि प्राप्त कर पहाड़ से उतर कर हावड़ा जिला के बाक्साड़ा में अपने गृह में रहकर एवं अपने गुरुदेव के आदेश से श्रीश्रीमाँ को ढूंढकर क्रियायोग की दीक्षा प्रदान की थी, जो उन्होंने हावड़ा के त्रिकालज्ञ योगीगुरु श्रीश्रीनिताइबाबा से प्राप्त की थी। महाराजजी ने अपने मन में उठे प्रश्न का उत्तर पाकर, स्थिर होकर श्रीश्रीमाँ की तरफ देखते हुए जैसे बैठे थे, सिर झुकाकर आत्ममग्न हो गये, क्योंकि, मन का प्रश्न, चिन्तन, इच्छा एवं मन में उत्पन्न किसी भी प्रकार की परिकल्पना को श्रीश्रीमाँ अनायास ही समझ सकती थी यह महाराजजी समझ गये थे। साधुबाबा की जो कुटिया थी उसमें कुछ सन्यासी शिष्य प्रायः साधनामग्न रहते थे। वे सभी अपने गुरुदेव की सेवा के प्रति सचेतन रहते। उस कुटिया में महाराजजी का आसन, हवन कुंड, त्रिशुल इत्यादि अवस्थित था। उन्होंने अपने शिष्यों का आधार देखकर मंत्र-दीक्षा एवं योग-दीक्षा प्रदान की है। स्वर्गगंगा अलकनंदा के तट पर महाराजजी के आश्रम में उनके पास बैठकर मन के भीतर एक अति विशाल अनंत आनंद की सृष्टि हुई। क्योंकि श्रीश्रीमाँ सब से कहती रहती कि किसी तीर्थ में जाने पर उत्तम महात्मा साधु का दर्शन कर लौटना चाहिए। सचमुच श्रीश्रीबद्रीनारायण की कृपा एवं श्रीश्रीमाँ की अंतरेच्छा एवं आग्रह के फलस्वरूप तीर्थ पथ पर वापसी के समय उच्च कोटि संपन्न एक योगसिद्ध महात्मा के दर्शन एवं प्रणाम के माध्यम से स्पर्शलाभ द्वारा उनके आशीर्वाद से मन में एक प्रकृत आनंद की सृष्टि हुई। साधुबाबा के पास जहाँ हमलोग बैठे थे वही पर धूप में एक चटाई के ऊपर कुछ अखरोट सूख रहे थे मेरी दृष्टि जैसे ही अखरोट पर पड़ी, साधुबाबा ने इशारे से सारे अखरोटों को लाने के लिए कहा। मैंने हँसते हुए ज्योंहि श्रीश्रीमाँ से यह बात बतायी तब श्रीश्रीमाँ ने आदेश दिया कि ''नहीं, बिल्कुल नहीं, तुमलोग पाँच लोग आये हो सिर्फ पाँच ही लेना। यहाँ पर जो बाबा के साथ हैं वे लोग नहीं खायेंगे क्या! बचा हुआ उनलोगों के लिए रहेगा।'' श्रीश्रीमाँ की बात सुनकर साधु बाबा हँसने लगे एवं मैंने भी हँसते-हँसते पाँच अखरोट बाबा को दिखा कर अपने जेब में रख लिये। साधुबाबा द्वारा श्रीश्रीमाँ हेतु चाय की व्यवस्था के लिए सोचने पर श्रीश्रीमाँ कहने लगी, ''बहुत देर हो गयी है बाबा आज हमसबों को हरिद्वार लौटने में रात हो जाएगी। मैं अब ज्यादा इंतज़ार नहीं करूँगी, आप आदेश दे तो हमलोग लौट चले।'' सिर झुकाए बैठे महात्माजी की दृष्टि श्रीश्रीमाँ के श्रीश्रीचरणों की तरफ थी, हाथ जोड़कर प्रणाम कर तथा सिर हिलाकर अनुमति देते ही, हमसब महात्माजी को प्रणाम कर लौट चले, उनके पर्वत गुहा में अवस्थित आश्रम और उससे सटी चिरसाक्षी स्वरूप प्रवाहमान स्वर्गगंगा से विदा होकर। वहाँ से लौटते वक्त मार्ग में श्रीश्रीमाँ ने हमें कहा कि, ''स्वामी नारायणगिरि बाबा ने मातृदर्शन की आशा से अनेक वर्षों तक प्रतीक्षा की है। आज उनकी यह मनोकामना पूर्ण हुई है। पवित्र हिमालय अंचल में वास करने वाले वे एक अलौकिक तेजस्वी महात्मा हैं, जिन्हें केशरी संत कहा जा सकता है। इस पुत आशा के पुरण होने के पश्चात् इस स्थूल काया को रखने की उनकी इच्छा नहीं रहेगी, उन्होंने अपने गुरुदेव सेमवारी बाबा से दीक्षा प्राप्त कर तिब्बत में १२ वर्षों तक कठोर साधना की थी, उसके बाद बद्रीक्षेत्र में पांडुकेश्वर के इस स्थान में साधनारत प्रायः ५० वर्ष व्यतीत किए। आज तुम्हें इतने शक्तिशाली और ओजस्वी महात्मा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।'' श्रीश्रीमाँ की अपार करुणा और कृपा से हमें इस तीर्थ यात्रा का सुअवसर तो मिला साथ ही साथ इस क्रम में गोपन रूप से रहने वाले अनेक महात्माओं के आशीर्वाद भी प्राप्त हुए।

पांडुकेश्वर एक छोटा संगमस्थल है, जहाँ गंगा के साथ अलकनन्दा के मिलन स्थान पर उत्थित पर्वत के शिखर से बहती हुई पतली जलधारा उतरकर पांडुकेश्वर में मिलती है। वहाँ के लोग इस संगम के पुण्यस्नान की महिमा से परिचित है। इस संगमस्थल के समीप ही है पांडुकेश्वर तीर्थ। बद्रीनाथधाम की यात्रा करते हुए मार्ग में जैसे हमें पंचप्रयाग मिलते हैं वैसे ही इस पथ पर पंचबदरी सम्मुखीन होते है। उनमें प्रथम है बदरीनारायण और द्वितीय है पांडुकेश्वर में

योगबदरी, जो हमारे यात्रापथ के मध्य था। उसके अतिरिक्त तीन और है ध्यानबदरी, आदिबदरी और भविष्यबदरी। जो हमारे तीर्थ पथ से कुछ दूरी पर जोशीमठ क्षेत्र के मध्य अवस्थित हैं हमारी गाड़ी पांडुकेश्वर को पीछे छोड़ते हुए जोशीमठ की ओर अग्रसर हो रही थी। पुल के माध्यम से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाना रोमांचकारी तो था ही साथ में नदी का कल-कल निनाद एवं वहाँ का प्राकृतिक सौन्दर्य आनन्द का अजस्र स्रोत था। आकाश एकदम निर्मल था अतएव प्राकृतिक सुषमा के मनोहारी दृश्य भावावेश उत्पन्न कर रहे थे। प्रकृति के अनुपम उपहारों का उपभोग करते-करते हमलोग जोशीमठ पहुँच गये थे। वहाँ पर एक अच्छे होटल में कुछ देर विश्राम कर दोपहर के भोजन के बाद वहाँ से रवाना हुए हरिद्वार को। हम सभी प्रयागतीर्थ का अतिक्रम कर एवं प्राचीन तपोभूमि ऋषिकेश को स्पर्श करते हुए रात ९:३० बजे हरिद्वार पहुँचे। सभी बहुत थक गये थे, लेकिन हरिदास धाम में खाने की पूर्व व्यवस्था कर दी गयी थी तथा आगामी कल अर्थात् दिनांक २१-९-२०१२ को दिल्ली से कलकत्ता लौटना निश्चित किया गया था।

दूसरे दिन प्रातः हरिद्वार से दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली हवाईअड्डे से दमदम एवं वहाँ से कलकत्ता स्थित अपने आश्रम पहुँचे। सफल हुई श्रीश्रीमाँ की तीर्थयात्रा एवं उनके द्वारा परिकल्पित श्रीश्रीमाता अन्नपूर्णा और विश्वेश्वर बाबा एवं लक्ष्मी-जनार्दनजीऊ के मन्दिर स्थापना के कर्म इत्यादि। इसके अतिरिक्त पूरण हुई हम सभी की मनोकामना जो थी हिमालय की देवभूमि के महापुण्य तीर्थयात्रा के साथ श्रीविष्णुतीर्थ के देवता श्रीश्रीबद्रीनारायण जी के दर्शन और वहाँ एकरात्रि निवास कर हिमाद्रिपति नगाधिराज के दर्शन की आकांक्षा, अपने अन्तःकरण की श्रद्धा के साथ श्रीश्रीबदरी नारायण जी के श्रीचरणों में निवेदित करता हूँ मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम।

ओम् नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण हिताय च
जगद्धिताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः।।

–मातृचरणाश्रित स्वामी संवेदानंदजी
हिन्दी अनुवाद–मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

–समाप्त–

पुराण कथा

नरपति क्षुप

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

प्राचीन काल में 'क्षुप' नरपति ब्रह्मा के क्षुत या छींक द्वारा ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने असुरवधार्थ इन्द्र से प्रेरित होकर, देवराज इंद्र से वज्र की उपलब्धि की। वे स्वेच्छापूर्वक नर शरीर धारण कर पृथ्वी के प्राप्ति बने। एकबार क्षुप एवं उनके मित्र दधीचि मुनि के मध्य 'ब्राह्मण बड़ा या राजा बड़ा', इस विषय पर बहुत तर्क-वितर्क हुआ। उस प्रचंड तर्क-वितर्क के समय दधीचि मुनि ने बहुत क्षुब्ध होकर क्षुप नरपति के मस्तक पर आधात किया एवं इस कारण क्षुप ने उन्हें वज्र द्वारा क्षत-विक्षत कर दिया। उस क्षत-विक्षत शरीर को ले कर दधीचि मुनि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के शरणागत हुए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मृतसंजीवनी विद्या की सिद्धि प्राप्त की थी। शुक्राचार्य ने तब दधीचि को सिद्ध मंत्र के बल से जीवित किया एवं महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तदनुसार दधीचि ने महादेव की आराधना कर वज्रास्थित्व, अवधत्व एवं अदीनत्व की उपलब्धि की एवं क्षुप नरपति के पास जा कर उसके मस्तक पर पदाधात किया। तब क्षुप द्वारा इस अपमान के प्रतिकारार्थ विष्णु के शरणापन्न होने पर भी भगवान विष्णु क्षुप के लिए कुछ भी नहीं कर पाये। अंत में क्षुप ने अपनी गलती समझकर दधीचि से क्षमा-प्रार्थना की। – इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि सत्वार्जित ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण रजोगुणी राजा से श्रेष्ठ एवं महान।

महाभारत में उद्धृत है, एकबार ब्रह्मा ने यज्ञ की मनोकामना की परन्तु स्वसदृश पुरोहित प्राप्त न होने पर उन्होंने अपने मस्तक में गर्भधारण किया। उस मस्तकस्थित गर्भ से प्रजापति क्षुप का जन्म हुआ। क्षुप ने महाप्रजापति ब्रह्मा के यज्ञ में पौरोहित्य किया था। कालांतर में महादेव ने उन्हें समग्रलोक का अधिपति बनाया।

सत्ययुग में वैवस्वत मनु ने राजा के रूप में राज्य किया था। उनका पुत्र प्रसन्धि, प्रसन्धि के पुत्र क्षुप, क्षुप के पुत्र इक्ष्वाकु। क्षुप को अपने पूर्वजों से प्रजा पालन हेतु जो तलवार मिली थी वह उसने इक्ष्वाकु को प्रदान किया।

(*सहायक ग्रंथ : महाभारत तथा विभिन्न पुराण*)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

कलियुग में भक्ति देवी श्रेष्ठ

(२)

देवर्षि नारद ने एकबार पृथ्वीलोक परिभ्रमण करते समय देखा एक तरुणी विषण्ण मन से बैठी थी उनके समीप दो अचेतन वृद्ध पुरुष दीर्घ नि:श्वास ले रहे थे। सैकड़ों रमणियाँ उसे परिवृत कर पंखा झेल रही थी और सांत्वना प्रदान कर रही थीं। कारण पुछने पर रमणी बोली..*(गतांक से आगे)...*

रमणी ने कहा – ''मैं भक्ति हूँ, ये दोनों पुरुष मेरे दो तनय ज्ञान एवं वैराग्य है। काल की गति से ये जर्जरित अवस्था में है। ये सभी देवीगण गंगा आदि नदीवृंद मेरे सेवार्थ यहाँ उपस्थित हैं। हे तपोधन! दया कर मेरी कहानी सुनें। मैं द्राविड़ देश में उत्पन्न हुई तथा कर्णाटक में पली-बढ़ी, महाराष्ट्र में कहीं-कहीं सम्मानित होने पर भी गुजरात आकर मैं अशक्त हो गयी। वहाँ पर घोर कलिकाल के प्रभाव-वश पाखंडियों ने मेरा सर्वांग चकनाचूर कर दिया है। बहुकाल इस अवस्था में रहते-रहते मेरे ये दोनों पुत्र भी निस्तेज हो गये हैं। तत्पश्चात् वृंदावन पहुँचकर मैं परम रूपवती रमणी में परिणत हो गयी हूँ। मैं स्वयं नवयुवती एवं मेरे ये दोनों पुत्र वृद्ध क्यों?''

नारद ने कहा - ''वृन्दावन में आने के फलस्वरूप तुम पुन: नवीन तरुणी हो गई हो। धन्य है यह वृन्दावनधाम जहाँ भक्ति सर्वदा ही नृत्यरत है। लेकिन तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का कोई गुणग्राही नहीं है, इसीलिए इन दोनों की वृद्धावस्था दूर नहीं हो रही। यहाँ पर ये किसी आत्मसुख प्राप्ति के फलस्वरूप मानों निद्राच्छन्न हो गए हैं ऐसा प्रतीत होता है।''

भक्ति देवी ने जिज्ञासा किया, ''राजा परीक्षित ने इस पापी कलियुग को रहने ही क्यों दिया?''

नारद ने कहा- ''हे साध्वी! भगवान श्रीकृष्ण जिस दिन से इस मर्त्यलोक को छोड़कर अपने परमधाम में चले गये है, उस दिन से ही इस मर्त्य में सब प्रकार के साधन भजन में विघ्न सृष्टिकारी कलियुग ने प्रवेश कर लिया है। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित ने कलियुग को इस कारण से वध नहीं किया क्योंकि योगसाधन, तपस्या तथा समाधि द्वारा जो फल लाभ दु:साध्य, कलियुग में वही फल अति उत्तम रूप से केवल मात्र श्रीहरि के कीर्तन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।''

भक्ति देवी ने कहा -''हे देवर्षि! मेरा अतीव सौभाग्य जो आप यहाँ पधारे। संसार में साधु दर्शन ही समस्त सिद्धिलाभ का परम कारण है।''

नारद ने कहा -''हे साध्वी! सत्य, त्रेता और द्वापर इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य थे मुक्ति के साधन, किन्तु कलियुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्मसायुज्य दान करती है। तुम साक्षात् श्रीकृष्ण की परमा सुन्दरी प्रिया हो। श्रीकृष्ण ने तुम से सन्तुष्ट होकर तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हारी दासी रूप में एवं ज्ञान और वैराग्य को तुम्हारे पुत्र रूप में दान किया। तुम अपने साक्षात् स्वरूप में बैकुण्ठधाम में भक्तों का पोषण करती हो, मर्त्यलोक में तो तुम भक्तों के पोषण के लिए केवल छायारूप में निवास करती हो। वहीं से तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर पृथ्वी पर आयी हो एवं सत्य, द्वापर पर्यन्त अत्यंत आनन्द में थी। कलियुग में तुम्हारी दासी मुक्ति आडम्बर रूपी रोग से आक्रान्त हुई और शीर्ण होने लगी, इसीलिए तुम्हारे ही आदेश से अति शीघ्र बैकुण्ठलोक में चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण मात्र से ही वह उपस्थित होती है एवं फिर बैकुण्ठधाम में चली जाती है, किन्तु इन ज्ञान और वैराग्य को अपने निज पुत्र बोध करते हुए अपने ही समीप रखा था। लेकिन कलियुग में इनकी उपेक्षा होने के फलस्वरूप तुम्हारे ये दोनों पुत्र उत्साह हीन और वृद्ध हो गये है, किन्तु तुम चिन्ता मत करो, मैं इनके नव-जीवन प्राप्ति के उपाय हेतु सोचूंगा। जिनके हृदय में प्रेमरूपिणी भक्ति सतत ही विराज करती है वह शुद्ध अन्त:करणवाला जीव स्वप्न में भी यमराज का दर्शन नहीं करता। तपस्या, वेदाध्ययन, ज्ञान और वैदिक कर्मादि किसी भी साधन से भगवान वशीभूत नहीं होते, केवल भक्ति से ही वशीभूत होते है गोपांगनाएं इनका प्रकृष्ट प्रमाण हैं। प्राचीनकाल में भक्त का तिरस्कार करने के कारण दुर्वासा मुनि को अनेकों कष्ट उठाने पड़े।''

भक्ति ने कहा -''हे नारद मुनि! आप धन्य है। मुझ पर आपकी निश्चला प्रीति है। मैं प्रत्येक क्षण आपके हृदय में अवस्थित रहूँगी, कभी भी आपको छोड़ कर नहीं जाऊँगी। हे साधु! आप अत्यंत कृपालु है। आपने क्षणकाल में ही मेरे समस्त दु:ख दूर कर दिए है। किन्तु मेरे पुत्रों की अचेतनता अभी भी दूर नहीं हुई है, इन्हें जागृत कर दीजिए।

सूतजी ने कहा -''भक्ति की यह बात सुनकर नारदजी को दया आ गयी उन्होंने उनके अंगमर्द्दन किए, उनके कान के पास मुख ले जाकर उच्च स्वरों में कहा, 'ज्ञान और वैराग्य जग जाओ।' फिर वेद पाठ, वेदान्त पाठ और गीता पाठ करके उन्हें जगाया। लेकिन क्षुधा तृष्णा से हुई दुर्बल अवस्था में उन्हें पुन: नींद लेते देखकर नारद जी को अत्यंत चिन्ता हुई एवं मन ही मन में सोचने लगे 'अब मैं क्या करूँ?' हे

शौनक! इस प्रकार चिन्ता करते-करते वे गोविन्द का स्मरण करने लगे। उसी समय दैववाणी हुई कि, 'हे मुनि! दु:खी न हो, इसके लिए आप एक सत्कर्म का अनुष्ठान करें।'

नारदजी अत्यंत चिंताग्रस्त होकर बदरिका वन में आ गये, वहाँ उन्होंने सनकादि मुनिश्वरों का दर्शन प्राप्त किया। नारद ने कहा, 'हे महात्मागण! दया कीजिए मुझे उस साधन से शीघ्र ही अवगत करवाइए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य - इनको सुख कैसे प्राप्त होगा?' सनकादि मुनियों ने कहा, 'हे नारद! श्रीमद्भागवत के शब्द कान में जाने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को महाशक्ति लब्ध होगी। श्रीमद्भागवत की ध्वनि से कलियुग के समस्त दोष नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेमरस प्रवाहिनी भक्ति अपने दोंनो पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक गृह में प्रत्येक मनुष्य के हृदय में क्रीड़ा करेगी।' नारद जी ने कहा– 'श्रीशुकदेवजी कथित भागवत शास्त्र का ज्ञानयज्ञ आरम्भ करेंगे। इस यज्ञ का उपयुक्त स्थान कहाँ हैं, कितने दिनों की अवधि में इसे सम्पूर्ण करना होगा, इसके विधि नियमादि क्या है, वह सब भी मुझे कृपा कर बताएं।' सनकादि कुमार ने कहा – 'हे नारद हरिद्वार के समीप आनन्दघाट नामक गंगा का एक घाट है। वहाँ अनेक ऋषि वास करते है, देवता और सिद्धगण भी वहाँ जाते हैं। स्थान माहात्म्य के फल से कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति देवी अपने चक्षुओं के समक्ष निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहाँ उपस्थित होगी। यह भागवत कथा कान में जाने से ही तीनों को तरुणावस्था प्राप्त होगी'।''

सूतजी ने कहा, ''यह कहकर सनकादि कुमारगण नारदजी के साथ श्रीभागवत कथामृत पान करने के लोभ से सीधे गंगा तट पर उपस्थित हुए। वे लोग जब गंगा तट पर पहुँचे उसी बीच भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक तक सर्वत्र यह संवाद फैल गया। भागवत कथा रसिक विष्णु-भक्त जो जहाँ थे श्रीमद्भागवतामृत पान करने के लिए सबसे पहले दौड़-दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कण्डेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर व्यास, पराशर, छायाशुक, जाजलि एवं जह्नु आदि सब प्रधान-प्रधान मुनिगण अपने-अपने पुत्रों, शिष्यों और सहधर्मिणीयों को साथ लेकर आनन्द के साथ वहाँ आए। इसके अतिरिक्त वेद, वेदान्त, मन्त्र, तन्त्र, सप्तदश पुराण एवं छ: शास्त्र मूर्तिधारण कर वहाँ उपस्थित हुए। गंगा इत्यादि नदी, पुष्करादि, सरोवर, कुरुक्षेत्र प्रभृति समस्त क्षेत्र, दिक्समूह, दण्डकादि अरण्य, हिमालयादि पर्वत एवं देव, गन्धर्व और दानवादि सभी उस भागवत कथा को सुनने के लिए आ गये थे। तब कथा सुनने के लिए दीक्षित होकर श्रीकृष्ण परायण सनकादि कुमारगण ने नारद प्रदत्त श्रेष्ठ आसन पर उपवेशन किया। समस्त श्रोताओं ने उनकी वन्दना की। चहुँओर से जय-जयकार, वाचिक नमस्कार शब्द और शंखध्वनि होने लगी और अबीर-गुलाल, फूल वर्षण होने लगे।''

सूतजी ने कहा –''इस प्रकार पूजा और सम्मानादि प्रदर्शन पर्व शेष होने पर जब सभी एकाग्रचित्त हुए तब सनकादि ऋषिगण महात्मा नारद को श्रीमद्भागवत का महात्म्य विशद्भाव से सुनाने लगे। सनकादि मुनियों ने कहा –'हम लोग अब आप सभी को इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाऐगें। इस महिमा के श्रवणमात्र से ही मुक्ति अधीन हो जाती है। श्रद्धा के साथ एक सप्ताह तक श्रवण करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है'।''

सूतजी ने कहा –''हे सौनक! भगवान ने अपनी समस्त शक्ति भागवत के मध्य रख दी है वे अन्तर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गये है। इसीलिए यह भागवत भगवान की साक्षात् शब्दमयी मूर्ति है। हे शौनक! सनकादि मुनियों ने जब एक सप्ताह श्रवण की माहात्म्य की व्याख्या की थी तब सभा में एक बड़ी आश्चर्य की घटना घटी। मैं वही कहानी तुम्हें सुना रहा हुँ सुनो। तरुणावस्था प्राप्त अपने दोनों लड़कों को साथ लेकर विशुद्ध प्रेमरूपी भक्तिदेवी बारबार - 'श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव' उच्चारण करते-करते अकस्मात् वहाँ उपस्थित हुई! समस्त सभासदों ने देखा कि परमा सुन्दरी भक्तिरानी तरुणावस्था प्राप्त अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को अपने साथ लेकर आयी। भक्तिदेवी ने अपने पुत्रों के साथ अत्यंत विनम्रभाव से सनत्कुमार को कहा 'कलियुग में हमलोगों का प्राय: अन्त हो गया था, आपके कथामृत सिंचन ने हमलोगों को पुन: पुष्ट किया है। मर्त्यधाम में यह भागवत परमब्रह्म का साक्षात् विग्रह है'।''

–ऐं गुरुदेवाय विद्महे चैतन्य रूपाय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्–

सहायक ग्रंथ – श्रीमद्भागवत

–मातृचरणाश्रित श्रीगौर गोपाल घोष

हिन्दी अनुवाद–मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

–समाप्त–

उन्मेष

(२३)

बुद्धपूर्णिमा - (दिनांक - ९/०५/०९)

क्रियायोग साधना के सम्बन्ध में श्रीश्रीमाँ के वचनामृत–

गतांक से आगे...

जिज्ञासु – तालव्य का क्या तात्पर्य है?

श्रीश्रीमाँ – तालव्य स्थूल देह की एक प्रकार की जिह्वा क्रिया विशेष है। उस क्रिया साधन के द्वारा साधक की जिह्वा क्रमशः लम्बी होकर तालु कुहर की आल्जीभ के पश्च-गह्वर

में जाती है; आलजीभ के पश्च-गह्वर में जाने पर वहिरंग में श्वास की गति रुद्ध हो जाती है अर्थात् नाक के छिद्र से श्वास की गति अन्तर्मुखी हो जाती है। जिसके फलस्वरूप मेरुदण्ड में गर्दन के पास दबाव पड़ता है जहाँ -Medula Oblongata है, वहीं पर सूक्ष्म रूप में एक छिद्र या ब्रह्मरंध्र है; प्राणायाम के फलस्वरूप अविरत दबाव से उस ब्रह्मरंध्र का दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता है एवं श्वास की गति अन्तर्मुखी होकर इड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना में प्रवाहमान रहती है। फिर क्रमशः श्वास सिर्फ सुषुम्ना वाही होने पर मस्तक के त्रिकूटी केन्द्र पर प्राण और महाप्राण का संयोग होता है। जैसे नीचे मूलाधार में आत्मयज्ञ करने पर प्राण-अपान के संयोग से एकप्रकार का अन्तर्यज्ञ होता है, वैसे ही प्राण और महाप्राण के संयोग से ऊर्द्ध में प्राणयज्ञ होता है। निम्नांश की भाँति वहाँ अग्निमय आलोक का प्रकाश नहीं होता, वरन् ऊर्द्ध में स्निग्धकरोज्ज्वल कोटि चन्द्र का आलोक प्रज्ज्वलित होता है। वहाँ पूर्ण चन्द्रमा की ज्योति के आभामंडल का प्रकाश देखा जाता है। फिर जिह्वा कपाल कुहर में प्रविष्ट होने पर सहस्रार के सोमरस का संचार होकर उस सहस्रारस्थित चन्द्र से स्निग्ध ज्योत्सना की बूँद-बूँद आलोकधारा क्षरण होकर कूटस्थ की गगन-गुहा के मध्य पतित होती है। फिर वह हमारे स्थूल देह में रसरूप में नीचे उतरकर देह में अमृतरस का संचार करते हुए नाभिकुंड में पतित होती है। नाभि में पतित होकर वह अमृतरस नाभिकुंड की अग्नि के तेज से फिर ओजः धातु में परिणत होकर योगी की स्थूल देह में सर्व नाड़ियों के मध्य वितरित हो जाती है। तब योगी के देह की नाड़ियाँ शोधित होकर अमृतमय हो जाती हैं। जिसके फलस्वरूप देह निरोग होती है। – इसे खेचरी मुद्रा कहा जाता है। इसका कारण है – मस्तक में व्योमतत्त्व है। त्रिकूटी के गगन गुहा में योगी की चेतना का स्फुरण होने के कारण इसे 'खेचरी मुद्रा' कहा जाता है।

सभी योगियों की जिह्वाग्रन्थि भेद होने से ही खेचरी मुद्रा साधित नहीं होती। इसके लिए और भी साधन करना पड़ता है। कई प्रकार की तालव्य क्रिया है। फिर जिह्वा को दोहन कराना पड़ता है। अथच पूर्वजन्मार्जित प्रबल संस्कार जिनके होते है उनकी जिह्वाग्रन्थि भेद न होने पर भी श्वास की गति सुषुम्ना में प्रवाहित हो सकती है। द्वितीयतः सद्गुरु की कृपाशक्ति से भी साधक की सुषुम्नाग्रन्थि भेद हो सकती है। तब जिह्वाग्रन्थि भेदन न होने पर भी श्वास की गति अन्तर्मुखी होने के फलस्वरूप जिह्वा साधन काल में स्वतः ही तालुकुहर में आकर्षित होकर अवस्थान करती है। सद्गुरु की कृपा शक्ति से सबकुछ ही सम्भव है। अनेक योगी खेचरी मुद्रा में सिद्ध होकर एक तरह की जड़समाधि अवस्था में पहुँच जाते है। वह जड़ समाधि अवस्था योगी के साधन पथ पर उन्नत चेतना में आसीन होने का पथ रोध करती है। इसीलिए सद्गुरु की कृपा शक्ति से इस जड़ समाधि की अवस्था को अतिक्रम करना ही योगी का कर्तव्य है।

जिज्ञासु – 'श्राद्ध गृह और यजमान गृह' – यजमान गृह का क्या तात्पर्य है?

श्रीश्रीमाँ – पुरोहित जो पूजा करते हैं, जिसके लिए पूजा करते है, वह उस पुरोहित का यजमान होता है। अर्थात्, जिसके नाम से संकल्प होता है उसे भी यजमान कहते हैं। जो पूजा का सब खर्च वहन करता है और पुरोहित जिसके लिए पूजा करता है उसे यजमान कहते हैं।

...क्रमशः

(श्रीश्रीमाँ सर्वाणी द्वारा रचित बंगला ग्रंथ 'उन्मेष' से उद्धृत)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुशीला सेठिया

गुरुगीता

(मूल अन्वय, बंगानुवाद व यौगिक और साधारण अर्थ सम्मिलित)

योगीराज श्रीहरिमोहन बन्धोपाध्याय

(१९)

हृद्यम्बुजे कर्णिकमध्ये-संस्थं
सिंहासने संस्थित-दिव्यमूर्तिम्।।
ध्यायेद्गुरुं चन्द्रकलावतंसं
सच्चित्सुखाभीष्टवरप्रदानम्।।६०
श्वेताम्बरं श्वेतविलेपयुक्तं
मुक्ताफलाभूषित दिव्य मूर्तिम्।
वामांगपीठे स्थितदिव्यशक्तिं
मन्दस्मितं पूर्णकृपानिधानम्।।६१
आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं
ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तम्।
योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं
श्रीमत्गुरुं नित्यमहं भजामि।।६२

हृद्यम्बुजे कर्णिकमध्ये संस्था यस्य तं (स्थितमित्यर्थः यत्) सिंहासनं (तस्मिन्) संस्थित दिव्यमूर्तिं, चन्द्रकलावतंसं, सच्चित्सुखाभीष्टवर प्रदानं, श्वेताम्बरं, श्वेतविलेपयुक्त, मुक्ताफलाभूषित दिव्यमूर्तिं (तद्विशिष्टं) वामांगपीठे स्थितदिव्यशक्तिं, मन्दस्मितं, पूर्णकृपानिधानम्, आनन्दम् आनन्दकरं, प्रसन्नं, ज्ञानस्वरूपं, निजबोधयुक्तं योगीन्द्रम्, ईड्यं, भवरोगवैद्यं (तम्) गुरुं ध्यायेत्। (तत्) श्रीमत्गुरुं अहं नित्यं भजामि।।६०,६१,६२

वे गुरु निराकार हैं, इसलिए उनका ध्यान किस रूप से होता है? इस के उपाय स्वरूप यही कह रहे हैं कि, हृदयपद्म के मध्य कूटस्थ रूप में उनका प्रकाश हैं, कूटस्थ में उसके ही ध्यान द्वारा गुरु को लब्ध किया जाता है। वे दिव्यमूर्तियुक्त (अर्थात् जगत् उस मूर्ति के आधारस्वरूप नहीं है, परन्तु जगत् के ध्यान-वर्जित होकर जगतोपरि आकाश में जीव की स्थिति होने से वह मूर्ति दृष्टिगोचर होती है, नचेत् जगत् मन को अधिकार कर रखने से वह मूर्ति दृष्टिगोचर नहीं होती।) हृदय में (अर्थात् भ्रूद्वय-मध्य) उस कमल का विकास होता है, उस कमल के कर्णिका (बीजकोष) मध्यस्थित सिंहासनोपरि उनकी स्थिति है। उस सिंहासन के चारों ओर चन्द्रकला के दीप्ति की तरह श्वेतवर्ण की आभा भूषण स्वरूप में विकसित है। सद्ब्रह्म का स्वरूप है इसलिए वह सत् स्वरूप हैं एवं चित्स्वरूप ब्रह्मपद पर सुखगति के लिए वे नियामक के रूप में रह रहे हैं इसलिए वह जीव के ईप्सित-वरदाता हैं। वह शुभ्र परिधानयुक्त हैं, अर्थात् जागतिक वर्णादि के मिश्रभाव हेतु वे शुभ्रवर्णयुक्त दृश्यमान होते हैं। जागतिक अप्रीतिकर दुर्गन्ध वहाँ नहीं रहती इसलिए वह सुखसेव्य एवं मलशून्य श्वेत-विलेपन द्वारा विलेपित है ऐसा अनुमित होता है। वह थोड़ा सा हास्य युक्त मुख से (अर्थात् स्थिर व प्रसन्न वदन में, एवं उच्चहास्य नहीं, जिससे मन विचलित होता है) साधक के प्रति दृष्टि निक्षेप कर रहे हैं; इससे समझा जाता है कि वह पूर्णभाव में कृपानिधान हैं (अर्थात् जीव को शान्ति पथ पर ले जाकर पूर्णभाव में कृपा वितरण के लिए वह प्रस्तुत रहते हैं)। दक्षिणावर्त से ध्यान करने पर वामदिशा में दिव्य-शक्ति का आविर्भाव होता है (इस शक्तिबल से जीव सर्वप्रकार अनुभव-शक्ति सम्पन्न होता है एवं इसकारण श्रीकृष्ण का रूप वाम की ओर झुका हुआ वर्णित होता है, इस कारणवशतः उनके वामांगपीठ पर दिव्य शक्ति विराजित रहती है कहा गया है। वह आनन्दमय हैं इसलिए उनके दर्शन से जीव आनन्दयुक्त होता है। वह स्थिर व प्रसन्नभाव सम्पन्न है इसलिए उनके दर्शन से जीव प्रसन्नभाव को प्राप्त होता है। वह ज्ञानस्वरूप हैं इसलिए तत्संग में जीव ज्ञानसम्पन्न होता है। उनकी सत्ता भाव के अन्तर्गत नहीं है इसीलिए वह सारे भावों के अतीतावस्था में अवस्थान करते हैं (अर्थात् उस से भाव की उत्पत्ति हुई है एवं वह भाव के अतीत है), अतएव वे भाव के अतीत होकर निज भाव में युक्त रहते हैं एवं साधक द्वारा उनमें आत्मसमर्पण करने पर वे साधक के निकट निजबोधरूप हो जाते हैं (अर्थात् साधक भी तद्वत् होकर भावातीत अवस्थालाभ करता है)। वे अभिन्नभाव से परब्रह्म के साथ युक्त रहते हैं इसलिए जीवसम्बन्ध से वह पूज्य हैं एवं योगीन्द्र (साधक उनके प्रति आत्मसमर्पण करते हुए अभिन्नभाव में रहने से वह भी परब्रह्म के सहित अभिन्नभाव में युक्त हो जाता है)। उनके

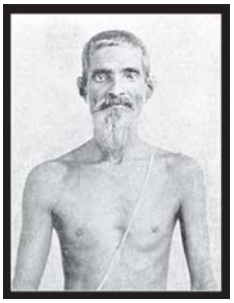

निकट उपस्थित होने से जगत् के सहित आसक्तिरूपी भवडोर द्वारा आबद्ध व्याधिग्रस्त जीव व्याधिमुक्त हो जाता है। ऐसे श्रीमत् गुरु का मैं नित्य भजन करता हूँ। ६०,६१,६२

निजबोधरूप – धृतराष्ट्ररूपी अन्धजीव को ब्रह्म प्रत्यक्षीभूत नहीं होते, वह इन्द्रियाधीन है अर्थात् वह स्वयं कुछ देख नहीं सकता – चक्षु जो दिखाएगा, कर्ण जो सुनाएगा इत्यादि भाव में वाह्य विषयादि के सम्बन्ध में उसकी अनुभूति होती है मात्र, परन्तु ब्रह्म अन्तर का विषय है, उसको आत्मा कहा जाता है, इन्द्रियगण का उसके निकट जाने का अधिकार नहीं है, अतएव यहाँ आत्मा को आत्मा को द्वारा देखना पड़ेगा – इस अवस्था को ही 'निजबोधरूप' कहा गया है। *...क्रमशः*

(कलकत्ता आदिनाथ-आश्रम के सौजन्य से प्राप्त)

हिन्दी अनुवाद – श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

श्रीश्रीमाँ का आध्यात्मिक कथोपकथन

(२)

श्रीश्रीमाँ – ''जो सद्गुरु होते हैं, वे अखण्ड मण्डल के विराट् महापुरुष के संतमण्डल और देवमण्डल द्वारा निर्वाचित होते है। सद्गुरु जगत् में विरल होते हैं। जो सद्गुरुरूप में अवतीर्ण होते हैं वे विराट् शक्ति के अधिकारी होते है। ऊपर से देखने पर साधारण मनुष्य के सदृश लगने पर भी उनका स्वभाव, उनके गुण, उनके कर्म इत्यादि साधारण नहीं होते। सद्गुरु, सद्गुरु द्वारा अभिषिक्त होते है। अपनी इच्छा से गुरु होना उचित नहीं है। किसी भी जीव को ऊर्ध्व चेतना में उत्तोलित करने का अधिकार सद्गुरु के अतिरिक्त किसी को भी नहीं है। सद्गुरु द्वारा ही समस्त जीव परमार्थलाभ कर सकते हैं। इसीलिए सद्गुरु भगवान स्वरूप। प्रकृत गुरु के बिना किसी का कुछ भी नहीं हो सकता। सद्गुरु ही एकमात्र ब्राह्मी दीक्षादान देने में समर्थ है। सद्गुरु की शक्ति तुम्हारे मन के मध्य जो मैल है उसे सर्वप्रथम धौत करेगी। दीक्षा के मुहूर्त से ही अन्तर के अनेक दृश्य तुम देख सकोगे। प्रकृत दीक्षा होने से उसी मुहूर्त से कुलकुण्डलिनी जाग्रत हो जाती है। तथा कुण्डलिनी शक्ति के जाग्रत होने के साथ-साथ तुम्हारे अभ्यन्तर में भी षड़रिपु जाग्रत होने लगेंगे। अनेक साधक षड़रिपु आघात को सहन न कर पाने पर धैर्य खो देते है तब सर्वप्रथम सद्गुरु पर ही दोषारोपण करते है और कहते हैं कि, ''बेकार यह सब करके कोई लाभ नहीं है। क्या दिया है आपने, कुछ भी तो नहीं हो रहा है।'' कुछ ही वर्षों में सब महर्षि, ब्रह्मर्षि और ऋषियों के सदृश योगैश्वर्यशाली होना चाहते है। विक्षिप्त चिन्ता, मानसिक चंचलता से ऐसा मन में होता है, इसका कारण है, मलिन माया का आवरण। तुम्हारी सत्ता माया से युक्त है। सद्गुरु की मायिक शुद्धदेह देख कर प्रतीत होगा - ये कुछ भी नहीं हैं। इस समय अनेक साधक साधन पथ से दूर चले जाते है, सद्गुरु की शक्ति पर अविश्वास पोषण करके, सोचते हैं – उनके ऊपर भरोसा नहीं हैं; निर्भरता रखी नहीं जा सकती। इस प्रकार पथभ्रष्ट होकर कुछ दिन इधर-उधर घूमकर पुनः श्रीगुरु के चरणतले शान्त बच्चे की तरह एकदिन उसे आना ही होगा, कारण, सत्ता में सद्गुरु का चिन्मय बीज जल रहा है। जब कोई शिष्य आकर कहता है, ''माँ मैं तुम्हारे प्रति विश्वास रखने में असमर्थ हूँ। पूरी तरह से मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। मैं परीक्षा में असफल हो जाऊँगा।'' – इस प्रकार मन खोलकर मन की अवस्था को सद्गुरु के समक्ष प्रकाशित करने से सद्गुरु खुश होते हैं। तब सद्गुरु कहते है – ''तुम ठीक पथ पर हो। तुम विश्वास करोगे कैसे, तुम्हारे श्वास की गति अभी स्थिर नहीं हुई है। तुम तो एक क्षुद्रातिक्षुद्र जीव मात्र हो। तुम्हारे सोच की क्षमता ही कितनी है? तुम्हारे मध्य जो आत्मशक्ति है, वे भगवान है। साधन नियमित करते जाओ। अन्तर से अन्तर्यामी जो शक्ति देंगे, जिस प्रकार तुम्हें चलायेंगे उसी प्रकार तुम्हारा रथ चलेगा। षड़रिपु और इन्द्रियादि के प्रवृत्ति के प्रवाह में रथ परिचालित होने पर सब घोर पंकिल अंधकार में डुब जाएगा। सद्गुरु प्रदत्त विद्या और उपदेश को पाथेय कर आगे बढ़ो। सद्गुरु जिसप्रकार तुम्हारे साथ संयुक्त हुए हैं तुम्हें भी उन्हें मन-प्राण से उनके साथ संयुक्त रहना होगा। 'मन से संयुक्त रहने' का अर्थ आत्मसत्ता का बोध में एवं 'प्राण से संयुक्त रहने' का अर्थ आत्मसत्ता के मध्य। सद्गुरु के अतिरिक्त और कोई गति नहीं है। सद्गुरु को प्रकृत परम-बंधु मानना चाहिए।'' *...क्रमशः*

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

श्रीश्रीभगवान किशोरी मोहन की पत्रावली

श्री अमरेन्द्र चन्द्र श्याम की कृति 'अखण्ड महापीठ' द्वारा प्रकाशित भगवान श्रीश्री किशोरी मोहन का जीवन ग्रंथ 'वृहत् किशोरी भागवत्'। इसके अंतर्गत भगवान किशोरी मोहन के अमूल्य आध्यात्मिक उपदेश समृद्ध पत्रावली से निम्नलिखित पत्रों को उद्धृत किया गया है।

पत्र संख्या (९)

ॐ

काशीधाम

फाल्गुन २५, १३४२ बं

शिष्य के प्रति तत्त्वोपदेश–

अनन्त शास्त्रं बहुवेदितव्यं,
स्वल्पश्च कालों बहुवश्च विघ्नाः।
यत् सारभूतं तदुपासितव्यं,
हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमिश्रम्।।
पुराणं भारतं वेदाः शास्त्राणि विविधानि च।
पुत्रदारादिसंसारे योगाभ्यासस्य विघ्नकृत्।
इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयं यत् सर्व्वज्ञातुमिच्छसि।
विज्ञेयोअक्षरसन्मात्रो जीवितश्चापि चञ्चलम्
विहाय सर्व्वशास्त्राणि यत् सत्यं तदुपास्यताम्।।

–उत्तरगीता तृतीय अध्याय।

इसका अर्थ भगवान ने कहा, शास्त्र अनंत, ज्ञेय विषय बहुत हैं, काल अल्प है, विघ्न बहुत हैं। जो सारभूत है वही ग्रहण कर उपासना करना, यही कर्तव्य है। हंस जैसे जल मिश्रित दूध से केवल सम्पूर्ण दूध ही ग्रहण करता है पुराण, महाभारत, वेद, अन्यान्य शास्त्र, पुत्र, दारादि संसार में योगाभ्याास में विघ्नकारी है। यही ज्ञान है, यही ज्ञेय, इस प्रकार जो कुछ भी जानने की इच्छा करते हो, सहस्र वर्ष की आयु होने पर भी शास्त्रों को संपूर्ण रूप से समझ नहीं सकोगे। परमात्मा अक्षय (नित्य) एवं सत्मात्र, किन्तु जीवन चंचल है। अतएव सर्वशास्त्र परित्याग कर जो सत्य है उसी की उपासना करो। अब; परमात्मा कैसे हैं, वह बता रहा हूँ। परमात्मा चैतन्य स्वरूप। उनके चैतन्य से तुम्हारे देहाभ्यंतर में और जगत् में चैतन्य की अनुभूति हो रही है। यह चैतन्य सर्वव्यापक है। इस चैतन्य का अपर नाम है चित्, इसीलिए परमात्मा को चिद्रूप कहते है। वही चैतन्य अस्तित्वशील सत्य है एवं उसके अस्तित्व से ही जीव का तथा जगत् का अस्तित्व है। इसीलिए उसे सत् कहते हैं। यह चैतन्य आनंदमय है इसीलिए इसे आनंद कहते है। इसीलिए परमात्मा का स्वरूप सच्चिदानंद कहा गया है। यह सत्ता और चैतन्य सर्वजीवों के अभ्यंतर में अनुभूत होता हैं। जीव सुषुप्ति काल में ब्रह्मोपलीन होकर अवचेतन होकर भी अपने स्वरूप द्वारा आनंद का भोग करता है। और शुद्ध, सात्विक एकाग्र चित्त से आत्मध्यान काल में परमात्मा की सत्ता, चैतन्य व आनंद की अनुभूति करता है। सत्ता व चैतन्य जैसे जीव द्वारा अनुभूत होते है, आनंद उस प्रकार से अनुभूत नहीं होता। दीपशिखा में दग्ध करने की तथा आलोकित करने की दोनों प्रकार की शक्ति हैं। किन्तु आलोक द्वारा कोई दग्ध नहीं होता, दाहिका शक्ति दीपशिखा के अंतर्वर्ती है उसीप्रकार संसारी जीव जितने तरह का आनंद उपभोग करते है, वे समस्त परमात्मा के आनंद का ही आभास हैं। वही परमात्मा शक्ति युक्त है, उसी शक्ति के बल से वह विभूतिवान हैं। यही है उनका ईश्वर तत्त्व। शक्तियुक्त होने से चैतन्यरूप होने पर भी उन्हें चेतन कहते हैं। उसी शक्ति का अन्य नाम प्रकृति, माया इत्यादि हैं। उनकी शक्ति एक होने पर भी त्रिआकार में सत्व, रज एवं तमो रूप में स्फुरित होकर उनकी सात्विकी शक्ति, राजसिक शक्ति व तामसिक शक्ति होना कथित है। ये त्रि-शक्तियाँ ही उनके वशीभूत है। शक्ति और माया उनके वशीभूत होने के कारण उन्हें मायी, मायाधीश कहते है।

यह सात्विकी शक्ति प्रकाशशीला, राजसिक शक्ति विक्षेपशीला एवं तामसिक शक्ति आवरणशीला है। इस सात्विकी शक्ति का आश्रय लेकर ही वे जीवों के पालनकर्ता, जीवों के कल्याणकारी, श्रुति के वक्ता तथा जीवों के उद्धारकर्ता है। इसी कारण सात्विकी शक्ति को उनकी परा या उत्कृष्ट शक्ति कहते है।

श्रुति में उद्धृत है की परमात्मा सगुण एवं निर्गुण उभय ही है। अपनी सृष्ट इस जीव-जगत् में सगुण-भाव में अंतःप्रविष्ट होकर इनकी स्थिति हेतु प्रयोजनीय सम्पूर्ण कार्य संपन्न करते है एवं निर्गुणभाव में सच्चिदानंद रूप में भी अवस्थित हैं। उनमें एक ही साथ सगुणत्व एवं निर्गुणत्व है।

श्रुति ने कहा है – 'पादोहस्य विश्वभूतानि त्रि-पादस्य अमृतंदिवि'। इसका अर्थ है – उनके एक पाद से ही जगत् एवं जीवों की स्थिति है, यही उनका सगुणत्व है एवं त्रिपाद गुणातीत निर्गुण।

शक्ति एवं शक्तिमान में भेद है। जैसे अग्नि एवं उसकी दाहिका शक्ति में अंतर है। अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति एक नहीं है। अग्नि की जिसप्रकार दाहिका शक्ति है, उसी प्रकार प्रकाश की शक्ति भी है। शक्ति और शक्तिमान में भेद रहने पर भी शक्ति का अस्तित्व शक्तिमान के सिवा और कहीं दृष्ट नहीं है। शक्ति का कार्य देख कर इस वस्तु में इस तरह की शक्ति है इस प्रकार कहा गया है। इस तरह शक्ति और शक्तिमान में अभेद रूप में एक ही वस्तु कथित है। केवलमात्र शक्ति को वस्तु नहीं कहते। इस वस्तु की ऐसी शक्ति है ऐसा कहा गया है। ऐसे ही शक्ति के अस्तित्व का परिचय पाया जाता है। परमात्मा में उनका स्वरूप चैतन्य व शक्ति एकीभूत होकर अवस्थान करते है, अभेद से एक कहकर जाना जाता है। *...क्रमशः*

–हिन्दी अनुवादः मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

प्रश्न ४५ : 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' अवस्था किसे कहते हैं?

उत्तर : जो जीव इस जगत् में सर्वमय, आनन्दमय और शान्त होकर सर्वत्र विचरण करते हैं उस जीव को सर्वज्ञ कहते हैं। जिस साधक को परम की उपलब्धि हो गयी है, जिन्होंने आत्मा की परिपूर्ण उपलब्धि की है उनका इस माया-प्रपंच के जगत् के साथ किसी भी प्रकार का मानसिक बंधन नहीं रहता; ऐसे व्यक्ति सर्वमय हो जाते हैं। वे सबों को आत्मस्वरूप देखते हैं। उनका द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। ये सबों में 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की उपलब्धि करते हैं। ये सबों को प्रेम दृष्टि से देखते है; उनके अंतर में किसी के प्रति राग-द्वेष, घृणा आदि बोध नहीं रहता। जो सर्वज्ञ हैं वे 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' दर्शन करने में सक्षम हैं।

प्रश्न ४६ : ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति का लक्षण क्या है?

उत्तर : एकाकी, कामना रहित, शांत स्थिर अटल-चित्त संपन्न अर्थात् जो चिन्ता रहित अवस्था में अवस्थान करते हैं एवं ईर्ष्याशून्य हृदय है जिनका, जो बाल-स्वभाववत् हैं उनको ही ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। ब्रह्मज्ञानी एवं सामान्य व्यक्ति के बीच व्यवहारगत भाव में जगत् में विशेष लक्षण परिलक्षित नहीं होता। ब्रह्मज्ञ व्यक्ति साधारण मनुष्य की तरह ही चलते-फिरते हैं। खाना-पीना करते हैं कर्म करते हैं, सोते हैं, वार्तालाप करते हैं किन्तु वे इन सारे कर्मों को मानों नाटकवत् करते हैं। प्रकृतपक्ष में जागतिक विषयों के प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं होती, उनके अंतर में कोई भी कामना या वासना नहीं रहती, वाह्यिक विषयों का कोई संकल्प नहीं रहता एवं वे अंतर में सर्वदा आत्मस्थित रहते हैं। आत्मस्थित व्यक्ति सर्वदा ही शांत एवं निर्विकार रहते हैं। ब्रह्मज्ञानी आत्मस्थित अवस्था में अवस्थित होकर सर्वदा उस आत्मपुरुष के निर्देश से ही अपनी जीवनधारा को प्रवाहित करते हैं। ये सारे ही ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति के लक्षण हैं। अंध मानव मायाबद्ध जीव उनको साधारण एवं सामान्य व्यक्ति समझते है किन्तु साधारण लोग जब उनके संपर्क में आते हैं तब ऐसा देखा जाता है कि साधारण का स्वभाव परिवर्तित होकर वह असाधारण बन गया है। ब्रह्मज्ञानी 'महात्मा' होते हैं। गुरुप्रदत्त कर्म नित्यसाधन करते-करते अंतर की उपलब्धि के द्वारा महात्मा को पहचाना जा सकता है।

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा

प्रसंग (५१) : मेरे गुरुमहाराज लाहिड़ीबाबा (श्रीसरोज कुमार लाहिड़ी) के बाल्य सखा बाबलादा (श्रीतिमिर वरण भट्टाचार्य), श्रीश्रीबाबा के सिर्फ बन्धु ही न थे, वे थे

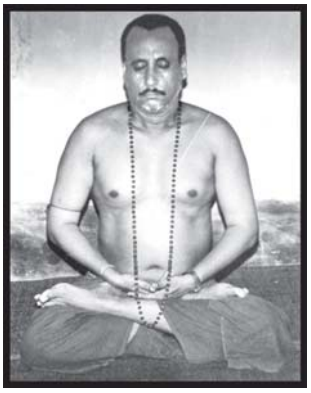

हरिहर-आत्मा के सदृश सम्बंधों से युक्त। गुरुमहाराज की माताजी ने बाबलादा को मातृसुलभ स्नेह के वशीभूत हो अपनी गोद में स्थान दिया कारण बाबलादा अपनी माँ को बहुत छोटे में ही खो चुके थे। इन बाबलादा के वंश का कुछ और परिचय दे रही हूँ। उनके पिताजी स्वनामधन्य श्रीकानाइलाल भट्टाचार्य वामफ्रन्ट के समय सत् एवं दक्ष शिल्प मंत्री थे। उन्होंने निरंतर फारवर्ड ब्लॉक का नेतृत्व किया एवं मंत्री पद पर थे। उनके नाम से हावड़ा के रामराजातल्ला में 'कानाई भट्टाचार्य कॉलेज' की स्थापना हुई है। बाबलादा सपरिवार गुरुमहाराज के घर में समय मिलते ही चले जाते थे। गुरुमहाराज के सान्निध्य में उनके जीवन में अनेक अलौकिक घटनाएं घटी है। यहाँ कुछ घटनाएं बाबलादा और बाबलादा की सहधर्मिणी के निज मुख से हमलोग सुनेंगे।

–मेरे (बाबलादा के) पिताजी एक बार दु:साध्य व्याधि से ग्रसित हुए। वर्ष था सम्भवत: १९७३, दिसम्बर महीने की १०-१२ तारीख रही होगी। उनके पेट में कोलाइटिस का अल्सर उन्हें बहुत दिनों से कष्ट दे रहा था। इस रोग में रक्तस्राव एवं पीड़ा होती है। एक दिन अतिरिक्त रक्तस्राव होने पर वे एकदम अस्वस्थ होकर मृतप्राय हो गये थे। तब सरोजदा (श्रीश्रीबाबा) जबरदस्ती मुझे गुरुमहाराज श्रीश्रीनिताइबाबा के पास ले गये एवं मैंने निताइबाबा के चरणों के पास बैठकर रोना शुरु कर दिया किन्तु मुख से कुछ उच्चारण नहीं कर पा रहा था। तब सरोज दा ने मुझसे कहा, ''अरे, रोने से क्या होगा, बाबा को अपने पिताश्री के संबंध में सब कुछ खुलकर कहो।'' तब निताइबाबा ने स्वयं ही सब कुछ जानना चाहा। सब कुछ सुनने के पश्चात् निताइबाबा हठात् बोल पड़े, ''देखो, तुम्हारें बाबा के प्रदीप में यदि बिन्दुमात्र भी तेल है, तो वे स्वस्थ होकर बच जाएंगें।'' उसके बाद ही हमलोगों ने देखा कि बाबा हठात् पद्मासन में स्थिर होकर बैठ गये एवं अगले ही क्षण उनका शरीर प्रचण्ड रूप से थर-थर काँपने लगा। यह देखकर हम लोग भयभीत हो गये। तत्पश्चात्, कुछ ही पलों के उपरांत (श्रीश्रीनिताइबाबा) सम्पूर्णरूपेण स्थिर हो गये एवं मेरी आँखों में आँखे डालकर कहा – ''तुम्हारे डाक्टर २३ दिसम्बर को आएंगे एवं कहेंगे कि ठीक अगले दिन अर्थात् २४ दिसम्बर को बाबा सम्पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे।'' यह तो भगवान गुरु की बात थी; अतएव मैं एवं सरोजदा निश्चिंत मन से घर आ गये। ठीक २३ दिसम्बर को पिताजी को जो डाक्टर देखते थे अर्थात् डा. सुखेन्दु विश्वास, उन्होंने आकर कहा -''मैं जो देख रहा हूँ उस से लगता है कि आगामीकाल में वे सम्पूर्ण स्वस्थ हो जाऐंगे।'' बाबा उसके बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गये।

महात्मागण इसी प्रकार मनुष्य पर कृपा करते हैं। आयु रहने से जीवन में तुफान उठने पर भी भगवान गुरुगण प्रारब्ध के भोग को अतिक्रम करने के लिए मनुष्य की सहायता करते हैं। महात्माओं के साथ संयोग प्राप्त करना जीवन में एक महिमामय मुहूर्त विशेष है। सत्संग से जीव का अशेष कल्याण साधन होता है।

प्रसंग (५२) : ''प्रदीप, मैं जो स्वस्थ होकर तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, तुम इसके बारे में नहीं जानते हो मेरे मस्तिष्क की अत्यंत जटिल और बड़ी शल्य-क्रिया हुई है। इस घटना से भी सरोजदा की विराट् महिमा का परिचय मिलता है। लोग जब दक्षिण-भारत में मस्तिष्क शल्योपचार करवाने के लिए जाते हैं तो एक अंजानी और प्रबल चिन्ता से घिरे रहते है कि रोगी बचेगा कि नहीं? और तब मेरी शल्य-क्रिया हुई थी हावड़ा के People's Nursing Home में; अपने मस्तिष्क-शल्यक्रिया के लिए मैं स्वयं भी अत्यंत भयभीत था कि पुन: बचकर आऊँगा कि नहीं? सरोजदा ने कहा, ''मैं तो हूँ। आप लोग कोई चिन्ता न करे।'' अपने शल्योपचार के पश्चात् मैं अचेतन अवस्था में

तीन दिन तक बिस्तर पर सोया हुआ था। साथ ही साथ सरोज दा भी पूरे तीन दिनों तक नखशिख चद्दर ओढ़कर सोये हुए थे; इन तीन दिनों में किसी प्रकार का जल या आहार ग्रहण नहीं किया था एवं मल-मूत्र का भी त्याग नहीं किया था। उस समय सरोजदा ने अपनी सन्तान एवं स्त्री को Nursing Home में मेरी देखभाल हेतु रोका था ताकि जरूरत पड़ने पर हमें मुश्किल न हो।

प्रसंग (५३) : बाबलादा निरंतर बोलते चले जा रहे थे – कुछ वर्ष पहले की घटना है, मैं अपनी छोटी लड़की को लेकर दिल्ली जाने वाला था, नौकरी दिलाने के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में बिठाने हेतु। मेरी छोटी लड़की ने Finance and Marketing विषय में MBA पास किया था। अतैव हमलोग दादा के पास अनुमति लेने के लिए गये किन्तु उन्होंने मना कर दिया एवं कहा, ''कोई भी कारण हेतु तुम्हारी लड़की इस बार परीक्षा नहीं दे पायेगी।'' तब भी हम लोग सरोजदा की बातों को महत्व ना देते हुए राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली चले गये यह सोचकर कि दादा (सरोजदा) बोलते हैं बोलने दो, वे तो हमलोगों के साथ हमेशा ही है। लेकिन दिल्ली में पहुँचने से पहले ही हम लोगों ने देखा कि, हमारा जो जरूरी समान वाला बैग था, जिसमें लड़की का Call Letter, हमलोगों का पहचान पत्र, समस्त धनराशि एवं और भी कुछ जरूरी सामान था सब चोरी हो गया है, जिस बैग को हमने एक विशेष जगह बड़ी हिफाज़त के साथ रखा था। जो भी हो, हम लोग बिना पैसों के निरीह अवस्था में दिल्ली पहुँचे एवं वहाँ रह रहे आपनी मौसी के लड़के के यहाँ आश्रय लिया; लड़की तो परीक्षा दे ही न सकी साथ-साथ हमलोग भी मानसिक तनाव से जूझ रहे थे एवं अस्वस्थ हो गये। आत्मग्लानि से भर कर हमलोग स्वयं को धिक्कारने लगे यह सोचकर कि दादा के निषेध करने के बावजूद भी हमने उनकी बातों का कोई महत्त्व नहीं दिया। उनकी अवहेलना की।

सिद्ध महात्माओं की वाणी कभी भी मिथ्या नहीं होती। अतएव वे जब किसी को कुछ कहते हैं तो उसके कल्याण के लिए, मंगल के लिए कहते है। सिद्ध महात्माओं के वचनों पर विश्वास करके पालन करना उचित है।

प्रसंग (५४) : ऐसी ही घटना पुनः एक बार घटी थी। इस बार भी मेरी लड़की की नौकरी के लिए परीक्षा का केन्द्र हैदराबाद में था। लेकिन इस बार फिर से वह भूल हमने नहीं दोहरायी। हमलोग दादा (सरोजदा अर्थात् हमारे श्रीश्रीबाबा) के पास अनुमति लेने गये लेकिन इस बार भी ऐसा संयोग हुआ कि उन्होंने हमें इज़ाजत नहीं दी। अतएव हम लोगों की इच्छा होने पर भी हम लोग नहीं गये। ठीक तीन दिन के बाद समाचार पत्र में देखा कि हैदराबाद में हठात् दंगा (riot) भड़क गया है एवं परीक्षा स्थल पर गोली चल रही है; बहुत से मनुष्य निहत हुए हैं, चहुँओर आगजनी हो रही है। सम्भवतः परीक्षा को रोक दिया गया है। ओह! दादा द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने पर हमलोग बाल-बाल बच गये।

सिद्ध महात्माओं के उपदेशों को ग्रहण करने पर जीवन में शान्ति और अनन्त मंगल होता है।

–जय बाबाजी महाराज–

...क्रमशः

–पितृचरणाश्रित श्रीप्रदीप चट्टोपाध्याय, शिवपुर, हावड़ा
हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रित श्रीचंद्र पारेख

आगामी अनुष्ठान सुची

श्रीश्रीमाँ का प्रवचन – २६ अगस्त,रविवार,सुबह ११ बजे
जन्माष्टमी – ३ सितम्बर, सोमवार, संध्यानुष्ठान ७ बजे
अध्यात्मिक सभा – ३० सितम्बर, रविवार, संध्या ७ बजे
महालया – ९ अक्टूबर, मंगलवार
दुर्गा नवरात्रि – १० - १९ अक्टूबर
१३ अक्टूबर (पंचमी):– संध्यानुष्ठान
१६ अक्टूबर (सप्तमी):– संध्यानुष्ठान
१७ अक्टूबर (अष्टमी):– श्रीश्री श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा के तिरोभाव दिवस उपलक्ष्य पर दोपहर में भण्डारा।
१८ अक्टूबर (नवमी):– श्रीश्रीदुर्गादेवी का महाप्रसाद
कोजागरी पूर्णिमा (लक्ष्मीपूजा):– २४ अक्टूबर, बुधवार

ज्ञानगंज के योग प्रसंग पर

योग व्याख्या - श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

श्रीविजन कुमार सेनगुप्त के विशेष अनुरोध से ड: गोपीनाथ कविराजजी के १८ पत्र के साधन मार्ग के निगूढ़ तत्त्व एवं साधन प्रणाली के ऊपर श्रीश्रीमाँ की योगव्याख्या–

ड: गोपीनाथ कविराजजी के पत्रावली प्रसंग पर :–

मर्मी साधक ड: गोपीनाथ कविराजजी के गुरुभ्राता

श्रीअक्षय कुमार दत्तगुप्त महाशय को ज्ञानगंज के साधनमार्ग के क्रियायोग के जो समस्त निगूढ़ तत्त्व, तथ्य एवं साधन प्रणाली के विषय पत्रों में उल्लेख किये गये हैं उनसे ही संबंधित कुछ प्रश्न :–

८। पत्र (९) - (प्रथम भाग) अवरोहण की धारा और आरोहण की धारा क्या है? क्योंकि सृष्टि की धारा नहीं समझने पर संहार या पुर्नवापसी (सृजन) की धारा को नहीं समझा जा सकता।

...जगत् में जो मनुष्य हैं वे तीन श्रेणियों में विभक्त होने योग्य है – साधक, योगी और साधारण मनुष्य। साधारण मानव जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते है; तत्पश्चात् उनका कुछ अवशिष्ट नहीं रहता। उनका पुनर्जन्म नहीं होता(?)। बाबा मृत्यु की बात नहीं करते। वे कहते हैं मृत्यु कहकर कोई वस्तु नहीं है(?)। ये सभी नर ५० के परवर्ती जो मोह-माया रूप अपार है उस में बोधहीन होकर लीन हो जाते हैं। मोह-माया में उनकी ऐसी कोई भी सत्ता नहीं होती जिससे वे वापस आ जाएँ। उनकी समस्त सत्ता ही खण्डित हो कर मिश्रित हो जाती है। जिनकी लौटने की बात है वे यदि न रहें तो लौटेगा कौन? ये सब एकबार जन्म लेते हैं एक बार कालग्रास होते हैं। तत्पश्चात् सब कुछ समाप्त। किन्तु जो साधक है वे मोह-माया के 'अपार' भेद कर भी वर्तमान रहते हैं। साधारण नर जड़ भावापन्न, परन्तु साधक के चैतन्यांश का विकास रहता है। उभय के मध्य यही प्रभेद है।

...साधक १०४ - इसके ऊपर उत्थित नहीं हो पाता। उसकी पंचम् में स्थिति होती है।

...योगी के बिना १०४ भेद कर उत्थान करने की क्षमता किसी की नहीं।

...साधारण नर योगनिद्रा से उत्पन्न होकर मोह-माया में विलीन हो जाता है। साधक भाव से उत्पन्न होकर गुण में स्थिति लाभ करता है। यही है चिदाकाश में अवस्थान। योगी अभाव से उत्पन्न होता है, स्वभाव में स्थिति लाभ करता है। योगी के अतिरिक्त १०५ से १०९ पर्यन्त भूमिलाभ किसी की नहीं होती। (इस विषय में श्रीश्रीमाँ का मत)

उत्तर - (पत्र ९ का प्रथम भाग) – सृष्टि की धारा के संबंध में कहने पर सर्वप्रथम यह कहना होगा कि विश्व प्रकृति के जड़ और चेतन पदार्थ के विभिन्न विषय के अलावा भी प्रधान दो प्रकार के सत्तात्मा देखने को मिलते हैं। –

(१) ईश्वर कोटि (जो आदि सृष्ट अयोनिसम्भवा श्रेणी)

(२) जीव कोटि (जो जगत् के विभिन्न स्तर के विभिन्न लोक के विभिन्न पर्याय में जीव सत्ता रूप में परिगणित)

उनमें इस जगत् के मनुष्य लोक में उन्हें तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है; जैसे साधक, योगी एवं साधारण मनुष्य। साधक के क्षेत्र में भी बहुत सी श्रेणियाँ है। योगी में भी वही एवं साधारण मनुष्य के क्षेत्र में भी बहुत सारी श्रेणी विभाग हैं। गीता में श्रीभगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, मनुष्यों की ये तीन श्रेणियाँ बतलायी है। कर्म और कर्मफल के नियमानुसार सभी मनुष्यों की गतिलाभ होती है। सकल जीवों की सत्ता ही सृष्टि नियम के क्रमविवर्तन धारा का अनुसरण कर चलती है। कर्मफल की धारा के अनुसार साधारण मनुष्य एवं साधक योगीगण जन्म-मृत्यु के कालचक्र में परिभ्रमण कर सत्ता के विवर्तन की गति में अग्रसर होते हैं एवं पिछड़ते भी हैं। जो पीछे रह जाते हैं एवं जो अग्रसर होते रहते हैं सिद्ध महात्मागण इन्हें सर्वदा उन्नयन पथ पर परिचालित करते रहते हैं। अति साधारण मनुष्य के क्षेत्र में विशेष भाव में इस जन्म-मरण, कालचक्र में आवागमन की घटना, मनुष्य के अज्ञानतावश संसार के मोह-माया इत्यादि के आवरण में आच्छादित होकर विष्णुनाभि के कालगर्भ में अतीव तमसाच्छन्न मोह गर्त में वे समस्त

आत्म-सत्ताएँ पतित होकर बोधहीन जड़ावस्था में परिणत होकर नष्ट हो जाती हैं। गीता में श्रीभगवान ने कहा है, आत्मा अविनश्वर; इसीलिए इस संबंध में कहा जाता है कि साधारण की व्यक्तिसत्ता ही ध्वंस को प्राप्त होती है, आत्मारूपी ब्रह्माणु का विनाश नहीं होता। बहुत युग-युगान्तर के पश्चात् कभी भी अगर परासंवित्मय चित्शक्ति का प्रवाह विष्णुनाभि के उस स्थल में प्रविष्ट होता है तब वे समस्त ब्रह्माणु पुनः सृष्टि अभिमुखी होकर, पुनः विभिन्न पर्याय के जड़ और चेतन प्रजाति श्रेणियों के मध्य आविष्ट होते हैं। इनका पुनर्जन्म नहीं होता, क्यों कि ये ध्वंस काल में कृष्ण-बीवर (black hole) में प्रविष्ट होने के समय ही स्व-स्वरूप को खो चुके हैं। प्रकृतपक्ष में मृत्यु का अर्थ 'क्षय' होता है। स्थूल देहावसान के पश्चात् साधकगण अपने शुद्धभाव के प्रभाव से प्रबल संवेग से विष्णु नाभिरूप काल सूर्य के उसपार ऊर्ध्व लोक में जाकर गति प्राप्त करते है एवं लोकानुयायी सूक्ष्म शरीर को प्राप्त होते है। इसीलिए कहा गया है कि साधक की सत्ता, मोह-माया का 'अपार' भेद करने के बाद भी वर्तमान रहती है। साधक पथभ्रष्ट होने पर सद्गुरु के उपदेश से योगावलंबनपूर्वक मोह-माया रूपी 'अपार' भेद करने में सक्षम होते हैं। साधक के पक्ष में चैतन्यांश का विकास रहता है इसीलिए ऐसा संभव होता है। जबकि साधारण जड़ भावापन्न नर के क्षेत्र में यह संभव नहीं होता।

साधक की १०४ के ऊपर की गति नहीं है, अर्थात् बोध, ज्ञान, भाव एवं गुण के ऊर्ध्व नहीं उठ पाते। साधक को कुंडलिनी शक्ति स्वचेष्टा से किसी भी उपाय से मंत्र अवलंबन कर जागृत करनी होगी। किन्तु योगी को कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं करनी पड़ती क्योंकि योगी अपने सद्गुरु के पास ब्रह्मविद्या रूपी योगमार्ग प्राप्त कर जाग्रत शक्ति को प्राप्त करता है। इसीलिए योगी के पास स्वकर्म है आत्मकर्म है पर साधक के पास स्वकर्म या आत्मकर्म नहीं है। स्वकर्म है इसीलिए योग साधनबल से योगी बहुधारूपी क्रियाशक्ति के अधिकारी होते हैं। और साधक के पक्ष में ये नहीं होते। इसीलिए साधक निज जन्मार्जित संस्कार एवं संवेगपूर्ण मनन-चिन्तन की सहायता से एकाग्र अध्यावसाय के फलस्वरूप पंचम यानि केवल विशुद्ध चक्र चेतना पर्यन्त स्थिति लाभ करने में सक्षम होते हैं। साधारण नर योगनिद्रा अर्थात् सुषुप्ति अवस्था की जड़ बोध से आते है इसीलिए सत्ता की कुंडलिनी शक्ति जड़ स्वभाव संपन्न रहती है। इस कारण उनकी सत्ता मोह-माया में विलीन हो जाती है। साधक भाव से आते हैं इसीलिए गुण में स्थिति लाभ करते है। (अर्थात् अंतस्थितः इड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना में क्रमानुयायी स्थिति प्राप्त करते हैं) – सुषुम्ना अवस्थान ही चिदाकाश में अवस्थान है। योगी अभाव से अर्थात् विशुद्ध जड़ अवस्था जो ब्रह्मभाव है, उस अवस्था से आते हैं एवं आत्मा या स्वभाव में स्थिति लाभ करने में सक्षम होते हैं। योगी सत्ता ही एकमात्र पूर्ण को प्राप्त करते हैं (अर्थात् शिवत्व लाभ) ये सब ही तो आरोहण धारा। (इसमें और भी अनेक प्रकार की बातें हैं जिसकी इस जगह चर्चा नहीं हुई)।

...क्रमशः

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

कृष्ण कथा

त्रिपुर दैत्य की कहानी

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

एकबार शिव, ''मैं जगत् का संहार कर्ता'' इसप्रकार मन में विचार कर अहंकारवश त्रिपुर दैत्य का विनाश करने हेतु उद्दत हुए। परन्तु दीर्घकाल तक युद्ध करने के पश्चात् भी भगवान शंकर उसका कुछ भी न बिगाड़ सके। वरंच तुमुल युद्ध के समय त्रिपुर दैत्य ने रथसहित शंकर को भूतल पर निक्षेप कर उन्हें संज्ञाहीन कर दिया। उस अवस्था में पड़े-पड़े शंकर ने श्रीकृष्ण की स्तुति आरंभ की। शंकर के स्तव से तत्क्षणात् श्रीकृष्ण ने शिववाहन वृषभ रूप धारण कर उन्हें वहन कर उनके हाथों में दिव्य शूल अस्त्र प्रदान किया। उस वृषभ स्कंध पर आरोहित अवस्था में दिव्य शूलास्त्र द्वारा भगवान शिव तब त्रिपुर दैत्य का वध करने में सक्षम हुए।

(*ब्रह्मवैवर्त पुराण से संग्रहित*)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

Surya-Narayan – Soul's Luminous Alter-Ego

The sun has been an object of interest since time immemorial. Every ancient civilization has given enormous attention to the Sun, covering religious, philosophical, scientific and social angles. The Surya of the Indic world is referred to as Helios by the Greeks, Sol in Latin, Tyr by the Teutons, Hvare-Khshaeta and Khurshed in pre and post Islamic Persia. Worship of the Sun is found in medieval cultures of South America and Africa as well. In the Indic civilization, the oldest surviving Vedic hymns refer to the Sun. The Sun has been a centre of attention in astronomy since ages. Its importance in our lives cannot be underestimated. Every day we discover new aspects of the Sun and the solar system. However, if we look at the Sun in the larger context of meta-physics and spiritual or yogic science, we see something very fundamental and deep, much beyond the material Sun or solar system or even a religious system of deifying the Sun. The whole of creative existence has its underpinnings in the Eternal Sun.

The Eternal Sun is the self-luminous alter-ego of the Universal Soul. It originates from the eyes of the Virat Purusha as He emerges from the great Void of Brahman so that the Supreme can 'see' itself in self-reflection. Its rays transmit existence-consciousness, penetrating the great Void to manifest the play (leela) of self-realized fulfillment. Its energy sprouts prana, the life-force, from which all of creation germinates and is sustained. Thus it is also known as Surya-Narayana. It permeates all creation as the invisible force through which everything becomes visible and viable. All bathe in its reflected, absorbed and re-transmitted glory. Its singular momentary pulse and pulsating nature creates Kaal (Time) and Kshana (Moments). Its Reverberation creates Nada, the cosmic vibration.

All of creation is like a cosmic galactic system of existence-consciousness with billions and billions of suns and planetary systems around them. Each such sun is a spark of the Eternal Sun that represents the Paramatma. The Atma-Surya in every individual being has the same self-enlightening nature as the Universal Sun. Omkar or Pranav-Surya, the seed of creation is a dual of the Eternal Sun having the same self-luminous properties and nature of Brahman, namely Sachchidananda. Different expressions of Omkar are given different names as deities or devatas. Primary three epithets of Surya arise from OM's first unfolding to A-U-M, and are called Brahma, Vishnu and Maheshwar – connected with the fundamental aspects of creation (or appearance), sustenance and annihilation (or disappearance), respectively. Surya as a heavenly deity is presented in the triad of Surya-Agni-Indra, each representing a unique enlightening power of the supreme, similar to A-U-M. It is especially relevant in a sadhaka, who sees the first light of spirituality through diksha when the inner Sun (Kutastha-Surya) becomes visible through the grace of the Sadguru. Sadhana is sustained through the power of Agni, which is the generated power of Kutastha-Surya

and the Kula-kundalini Shakti ignited by the Sadguru. Finally, death is transcended through the power of Indra's thunderbolt crashing in within and uplifting the Jiva to Shiva-hood's liberated existence. Surya as a planetary deity is one of the nine 'navagrahas' of the zodiac system of ancient Indian Astronomy and Astrology.

There are many other expressions of the Sun and each deity, which is actually the representation of a specially expressed force is a luminous sun by its own name. Specially synonymous with Surya in ancient Indian literature include Aditya, Arka, Bhânu, Savitru, Pushana, Ravi, Mârtanda, Mitra and Vivasvâna, each having an interesting background and associated story in the literature. Aditya refers to one with the splendour. There are twelve Adityas mentioned in the Bhagwat Purana, each referring to a reigning Sun-God for a particular month. They are called so as they are born of Sages Aditi and Kashyap. Interestingly, as very recently discovered, the ancient city of Varanasi was designed by installing twelve Aditya deities in such a manner that a straight line from the city centre through each deity indicated the position of the rising sun on the full moon day of that particular month. The Konark Temple – so named as it is 'Kona-Arka' or the Corner of the Sun – is another masterpiece in scientific planning, geometry, astronomy in its design as it ushers in the first ray of light into the sub-continent and has unique sun and moon dials, of which only some have been explained in modern times. Each of these shows how the sun has been an intricate element of all aspects of life.

The iconography of Surya as a planetary deity is depicted in many verses of the Vedas and can be conceived as the yogic interpretation of the embodied soul seeking self-realization. Surya is the image of the supreme soul, the eye of the universe, riding an effulgent golden chariot (of a three layered embodiment of physical-astral-causal) with one turning wheel (of Time) having twelve spokes (months), six sections of the rims (seasons) and three axles (chatur-masyas in material sense and past-present-future in the philosophical sense). It is driven by seven horses (depicting the seven primary colours, vayus, rhythms or meters of the mantras, indriyas or senses plus mind and intellect), and the charioteer (jivatma's ego or I-ness) sits with his face backwards (inwards) looking at the sun (soul).

The Sun and Moon play an important role in yogic science. The astral human form, symbolized by the seven chakras, ida-pingala-shushumna and other channels, is structured like an omkar with the som-mandal at the sahasrara in the head (depicting the lunar store of amrita) and solar sink at the Manipura powered by the Vishnu-nabhi, where the bottom of the Omkar turns upwards. The turn in the middle of the omkar where it loops is the astral heart where the spark of the atma glows. During yogic practice, drops of amrita nectar fall from the sahasrara through the shushumna into the surya-mandala of the Vishnu-nabhi, vaporize into ojas-teja and energize the whole being through the astral channels, while the mind's eye remains in fixed gaze at the spark of the soul. Again this energy gets uplifted through the channels into the sahasrara and condenses into soma nectar. This sacrificial cycle or yagna is called "ha-tha" yoga where 'ha' and 'tha' indicate the moon and sun. All of creation is sustained by this balance between the eternal sun and moon's cycle though the shushuma and other nadis. Thus Sant Kabir sings, "Joh ek neer hai Ganga-ji, ek Naam hai Ram, Joh ek Chand

aur ek Sooraj, nirbal ke bal Ram" – depicting the whole of yogic self-realization's core. Here Ganga-ji symbolizes the Shushumna, Ram the Soul, Chand and Sooraj the Ha and Tha. This is what gives strength (bal) to the jiva (nirbal or powerless). Poet Tagore also speaks of a similar experience in his famous song, "Anandadhara Bohichhe Bhubane" when he talks of the amitra nectar flowing through as the anjali (offering) to the Soul between the Sun and Moon while the Eternal Jyoti (of the Soul) illuminates the (inner) world.

Surya Vigyan or solar science is considered one of the most powerful sciences among yogis. Swami Vishuddhananda Paramhansa, who learnt this in Gyangunj, demonstrated this using several specially obtained crystals during his life-time. Apparently, both the material and astral components of surya-rashmi can be guided to bring about apparently magical material transformations. But it needs a yogic eye of a master and very immaculate knowledge of nature and specific mantra skills to be able to do this. Hopefully someday our understanding from the point of view of materialistic science will improve for us to be able to better understand and harness the sun for the sustenance of quality life.

There are also some basic techniques described in the scriptures to harness the sun's rays and form clouds for rain. Though Sree Sree Maa hardly ever presents such things so that we are not distracted from the basic goal of self-realization, in very rare occasions we have seen her deploy such methods. One such event occurred about twenty-five years ago, when she was residing in Parnasree. There was no rain for long and drought was being reported in various districts of Bengal. Lakshmi-da earnestly requested Sree Sree Maa to bring succor to the lives of people. Maa said that rain can be caused by harnessing the astral 'dark rays' of Surya-Narayana and there is a method for it. So after much request she agreed and a puja was performed by her at night wherein she made twelve Shiva idols from clay and performed worship of the Sun God in a particular manner as prescribed in the scriptures. After that in the early morning, the idols were immersed in a pond nearby. She said that rains will come after one day at around 4 pm. Lakshmi-da, remaining very skeptical began to wonder from the morning whether anything would happen and constantly began pestering Maa with questions like "Will it happen?", "There is no sign now, what do you say?" etc. since morning. All were deeply frustrated by this constant impatient nagging. Finally as the clock struck 4 pm, suddenly the skies became dark and torrential rain poured for hours together. Then Kajal, in his typical style, simply opened the back door and pushed Lakshmi-da out in the open and locked the door from inside. Kajal remarked, "Lakshmi-da should really feel the rain to believe that it has actually happened!" The doors were not opened as the rains pounced on him and no heed was paid to Lakshmi-da's requests to let him in till Sree Sree Maa intervened. With yogis, you get to see so many aspects of what is unknown to science.

The Sun remains one of the most enigmatic entities of human enquiry through ages, civilizations, philosophies and sciences. It will continue to remain so as it encompasses and permeates all existence including our own selves. We thus pray to see its light and ourselves in its light – our very existence-consciousness as its sparkling rays – and dance in self-illuminated bliss as the play of the divine ensues all over.

–her Blessed Child,

Prof. Partha Pratim Chakrabarti

Gems From the Garland of Letters

[Letters of Bhagwan Kishori Mohan]

(27)

Spiritual Advice Towards a Disciple

(...Continuing)

Without the will and resolve of God, Nature by Herself cannot create and sustain this cosmic manifestation; all this must be directed and supervised by Consciousness and cannot be accomplished by the non-spontaneous *Shakti* alone. Although Nature possesses active energy, God is the Governor. Be devoted, surrender yourself and remain ever attached to God, comprehending and assimilating these core ideas—this is the Supreme yoga.

Bhagwan Kishori Mohan

Similarly, creation cannot be realized by the supreme Consciousness (*Chaitanya*) without the involvement of the eternal Divine Force (Shakti) – in fact, devoid of *Shakti*, it is impossible for the *Chaitanya* to perform any activity. Otherwise, *Chaitanya* would forever remain in the same state as He does during the ultimate dissolution of the universe. Consciousness and the Divine Force remains in harmonious union and realizes the activities of creation, sustenance and destruction. The holy scriptures have sometimes mentioned Consciousness and at other places attributed the Divine Force, as the causal source of the cosmic expression. It should however be understood that wherever *Chaitanya* has been attributed as the origin of creation, the actual intention is to signify *Shakti*-conjoined *Chaitanya*. Similarly, wherever the scriptures say that cosmic manifestation commences from *Shakti*, they actually intend to convey *Chaitanya*-blended *Shakti* as the origin of creation. Hence, the essential meaning is same.

The Divine Force never remains singular, Consciousness is Her eternal shelter. Whom we ascribe as 'God' (*Ishwar*) is essentially this *Chaitanya*-mingled *Shakti* or *Shakti*-mingled *Chaitanya*. *Shakti* is always united and a part of God. *Shakti* and Her Lord (*Shaktiman*) are one, indistinguishable and equivalent. The *Shruti* has sometimes described the *Paramatma* (Universal Consciousness) as attribute-less (*Nirgun*) and passive, and His Divine Force (*Para-Shakti*) is represented as the Universal Governor (*Ishwar*). For example,

"Na tasya karyang karanam-cha vidyate,
na tat-sama abhyadhikas-cha driyshyate
Para-asya shaktir-vividhaiva shruyat,
swabhaviki gyana-bala kriya-cha."

Meaning: The Lord is unparalleled in His supremacy and exists in absolute changelessness beyond all activities. Everything is conducted naturally and systematically through His dynamic multifarious divine powers of knowledge.

Here, the word '*Karan*' refers to the senses (*indriya*). The *Paramatma* is beyond all senses and therefore, he is inactive. His Divine Force is naturally associated with the qualities of knowledge, power and activity. This Shakti is spontaneous and hence, not devoid of *Consciousness*. The 'one sentence' in the *Shruti* which aptly captures the overall purport of the worship of *Shakti* is as follows. The *Chandi* says, "*Esha*

Prasannya...", —when propitious, She (*the primordial Divine Force*) acts as the eternal cause of the cosmic manifestation, its sustenance and destruction.

Wherever the holy scriptures have praised and advocated the worship of *Shakti*, the adorations have been actually directed towards the Spontaneous Divine Force and not the *Shakti* which is devoid of Consciousness – this is nothing else but the worship of God. The *Shastras* have never prescribed the worship of absolute non-spontaneity, even though there are suggestions towards the worship of certain inanimate bodies when Godly divine powers are ascribed on to them. For example, worship of Lord *Vishnu* is accomplished when qualifications associated with Lord Vishnu are attributed to the '*Shalgrama*' stone. Similarly, worship may be successfully accomplished when conducted by ascribing qualifications associated with a certain Deity to His respective idol. These cannot be labeled as idolatry as worship of the concerned inanimate body is never intended in them.

All communities prescribe worship of their cherished Deities as God. Although, there is variety and heterogeneity in the idols of Demigods and worship procedures, all such worships are essentially the revered contemplation of the One Universal God. Differences among Demigods and mechanisms of worship only exist at lower layers, all such distinctions wither away at higher and more refined realms of contemplation. If an individual worships a Deity with an emotive attitude which is distinct from that with which God should be contemplated upon, then such meditative contemplation gets specifically directed towards that Deity and not God. Contemplation on God leads to complete and absolute enlightenment of knowledge and power, while meditation on any other Demigod leads only to partial and incomplete spiritual realization.

The Bhagavad Gita says,

"*Devan deva-yajo yanti mad-bhakta,*
yanti mam-api."

Meaning: The votaries of a Demigod obtains the Demigod, while devotees of the One Universal God obtains Him.

The Shruti proclaims,

"*Yattyadeva upasate tattyadeva bhavati.*"

Meaning: Whoever a parson contemplates on through his meditation, that verily he becomes.

Irrespective of the medium in terms of the idol, form or embodiment involved, contemplative ascription of the Absolute Divine Knowledge and Force onto the medium, leads to votary of the One and Absolute God.

According to distinctions in the preferences and contemplative capacities of individuals, different meditative procedures have been suggested. However, the ultimate objective of all *Shastras* is the meditative contemplation and attainment of the One Universal God. Instead of interfering into the distinct customs and emotive principles of different sects as described in the *Puranas*, the great sage *Maharshi* Veda Vyas has prescribed meditative contemplation of the One and Absolute Brahman through all such varied forms of worship.

—Her blessed child,
Sri Arnab Sarkar

Patience is a priceless possession. Exert yourself to always nourish it.
—Sri Sri Ram Thakur

Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo

(51)

Bablada (Sri Timir Baran Bhattacharya), the childhood friend of my Guru Maharaj Lahiribaba (Sri Saroj Kr. Lahiri), was not just a friend of Sri Sri Baba, but both of them were inseparable souls like Harihar. The mother of GuruMaharaj used to treat Bablada as her son as Bablada's mother expired during his early childhood. Let me throw some light on Bablada's family. His father, Late Sri Kanailal Bhattacharya was famous as the industry minister during the Left Front rule, as he was very honest and competent. He always stood in favour of Forward Block and was elected as its leader and minister. The 'Kanai Bhattacharya College' of Ramrajatala was named after him. Bablada used to visit Guru Maharaj's house with his family whenever he got an opportunity. Lot of miracles happened when they were in the company of Guru Maharaj. We shall hear a few such incidents from Bablada himself and his wife -

Sri Sri Saroj Baba

Sri Sri Nitai Baba

My (Bablada's) father once contracted a serious illness. It was around 10th or 12th December, 1973. He was suffering from pain in the ulcers of colitis for a long time. This disease is featured by severe bleeding and pain. On that particular day, my father was very ill and episodes of severe bleeding made him extremely morbid. Then Sarojda (Sri Sri Baba) took me to Guru Maharaj Sri Sri Nitaibaba forcibly and I sat at the feet of Nitaibaba, crying but could not say him anything. Then Sarojda told me, 'Oh, no, don't cry but narrate your father's state to Nitaibaba.' Then Nitaibaba wanted to know the matter himself. On hearing the details, Nitaibaba suddenly said, "Look, if your father has oil in his lamp, then he will survive and recover. Then we saw Nitaibaba sitting in Padmasana and his whole body started to vibrate intensely. We became very afraid. After some time Sri Sri Nitaibaba became still, looked at me and said, "Your doctor will come on 23rd December and he will say that your father will be completely well on 24th December." This being the holy utterance of Bhagwan Guru, myself and Sarojda came back home totally assured. Exactly on 23rd December, the Doctor who used to treat my father, Dr. Sukhendu Biswas came and said, "As far as I see, your father will be totally cured tomorrow." My father truly became healthy.

This is how the mahatmas shower their grace on man. In case of severe untoward event of life, the Bhagwan gurus help man overcome his prarabdha karma, if he has longevity. It is indeed a glorious moment to get into association with a mahatma. Satsang has unlimited benefits in a man's life.

(52)

"Pradip, I am talking with you after being cured, but you are not aware that I have undergone a big operation in my brain. This is also a divine grace of Sarojda. Even today when people go to South India for brain surgery, they are doubtful regarding the survival of the patient. And I was operated at People's Nursing Home at Howrah; I too was quite fearful

about my survival following brain surgery. Sarojda reassured me, 'I am there, do not be stricken with anxiety.' After my brain operation, I lied on the bed for three days, fully unconscious. Sarojda also laid down on the bed for those three days, fully covered with a bedsheet. He neither did eat or drink anything on those three days, nor did he pass any urine or faeces. Sarojda kept his wife and children at my Nursing Home on those three days lest I may require any help" – Bablada narrated me this episode gently from the store of his memory.

(53)

Bablada went on saying – "A few years back, I was to go to Delhi with my younger daughter, who was to appear in an entrance examination for some job. My younger daughter passed MBA in Finance and Marketing. So, we went to take permission from Dada who disagreed to it and said, "Your daughter will not be able to appear in the examination due to some reason or the other." But we didn't obey him and boarded the Rajdhani Express thinking that in spite of his disapproval, he will be with us. Before we reached Delhi, we found that the bag that contained the call letter of my daughter, our identity proof, money and some essential items was stolen. We kept the bag in a secured place. Anyway, we reached Delhi absolutely penniless and took shelter on one of our cousin brother's house who is settled in Delhi. There was no possibility of my daughter to appear in the examination and we all became mentally distressed. We felt very guilty that in spite of Dada's prohibition, we boarded the train against his wish."

The words of a realized mahatma are never false. So when he says something to others, he aims at their benefit and welfare. It is imperative to follow the directions of a realized mahatma with full faith.

(54)

Such an event happened again. This time our daughter's seat for entrance examination for the job was at Hyderabad and without mistake we went for Dada's permission, but he refused this time also. Hence, in spite of our desire we did not go. After three days, we read in the newspaper that there was an outbreak of riot at Hyderabad and firing happened at my daughter's proposed seat for examination. Some people were killed and there was a great unrest there. Probably, the examination was also cancelled. Hence we could save ourselves this time by obeying Dada's order.

When the advice of accomplished mahatmas are followed, life becomes full of peace and unending prosperity.

...to be continued

-Sri Pradip Chattopadhyay, Shibpur

-Translated into English by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

If you desire to be pure, have firm faith and slowly go on with your devotional practices without wasting your energy in useless scriptural discussions and arguments. Your little brain will otherwise be muddled. Through selfless work, love of God grows in the heart. Then through his grace, one realizes Him in course of time. God can be seen. One can talk with Him as I am talking to you. **—Sri Ramkrishna Paramahansa**

Biography of Manicklal Dutta

[A disciple of Mahavatar Sri Sri Babaji Maharaj]

(6)

I feel imperative to narrate a brief description of the sincere, amiable, hospitable aspirant Bhutnathbabu, for the curiosity of the readers, whose tremendous contribution flourished the later spiritual life of Manicklal. This Bhutnathbabu was the brother-in-law of the famous doctor of Kolkata Dr. Durgacharan Bandopadhyaya. He was a compounder in the chamber of Dr. Durgacharan. The doctor, one day, said to Bhutnathbabu on the verge of his retirement, "Look Bhuto, you are not a qualified doctor to earn your livelihood by this profession; hence I will teach you a formula with which you can make an oral preparation for malaria and can earn lot of money by selling it in the malaria-stricken rural belts of Bengal. But you have to touch my feet and promise that the day you have a small basket full of money by selling the oral preparation, you will stop selling it." Bhutnathbabu touched the doctor's feet and took the oath as a mark of gratitude towards his master and his sister's husband. Then he received the proposed formula and named it in Bengali `Jarer Kalantak' (causing universal dissolution of fever). Later on he arrived at Kanu junction, opened his own chamber and started to earn money by selling the drug preparation. He was a compassionate friend of the poor and needy people of the locality. When any patient with fever came to him for treatment, he used to say very politely, "Call me when all other doctors would fail. Because I am not a qualified doctor." He did not only give medicine to the patients, he has taken responsibility of, but he would sit beside the patient bed, give him the medicine and did not leave the patient until he was relatively better. He earned a lot in attending the calls of the patients in addition to selling the medicine. Bhutnathbabu had an iron vault, beneath the mud, in a special room of his house, whose cover faced up. Bhutnath used to go into the room occasionally and dropped his accumulated money from his pocket into the vault. The daily earning from selling the medicine, that accumulated in the basket was also put inside the vault at the end of the day. He was always so busy and preoccupied that he had no scope of counting his earnings. Dishonest persons took full advantage of the situation and in many cases they cheated him, by giving the obsolete currencies. But he was never angry and he would encourage competition among boys in throwing obsolete currencies in the nearby pond to stop repeat use of those currencies.

Sri Manicklal Dutta

Bhutnath had a small ashram for sadhana close to his house, in his garden where many sages and sanyasins used to come from different regions. It was the daily practice of Bhutnathbabu to join with the sages at the ashram after his day's work and stay there till late night with them, being engrossed in yogic practices and scriptural discussions. Bhutnathbau had an alloted amount for buying a basket of maida and a 'Sree Grita' ghee tin weighing 2.5 ser everyday for making food for the ashram sadhus. He arranged to bring the ghee from Bolpur. The sadhus used to make chapatis of their own, in the sacrificial fire, enkindled in front of them with the maida and ghee, along with

the scriptural discussions. Bhutnathbabu's grandson Dr. Sri Ramchandra Mukhopadhyaya is still engaged in medical practice in the place and he is to some extent aware of his grandfather's activities. Meanwhile, Manicklal was having a nice time at Bhutnathbabu's house. Manicklal was naturally hesitated and perplexed at the profuseness of food ingredients regularly at morning, afternoon, evening and night there. It was the instruction to deliver the food ingredients for Manicklal, at a time, inside a lonely room and all, who were associated with this work were habituated with it. Bhutnathbabu's younger son, Nalin, was entrusted with the responsibility of looking after Manicklal throughout the day. In the daytime when Bhutnathbabu was busy with his patients, Manicklal used to spend his spare time in the nearby Kanu junction and hence he developed a deep and intimate relation with the station master and the other employees. At night, Bhutnathbabu used to accompany Manicklal to his nearby ashram, get in touch with the sadhus there and become intoxicated with scriptural dictations and its discussions. During these spiritual discussions, the sages frequently became glad with Manicklal and gracious enough to share with him their self-made chapatis.

In this way a few hours elapsed and then Manicklal would retire for the day, at around 2-2:30 am obediently at the instruction of the sadhus.

..to be continued

—Sri Ardhendu Sekhar Chattopadhyay

Translated into English
by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

Unmesh

[Soul's Blooming - Part II]

Sree Sree Maa Sharbani

About Kriya Yoga (Jhulan Purnima: 17/08/2008)

Sree Sree Ma's remarks – After receiving initiation from a Divine Master (Sadguru), from the moment of initiation, Kriyabaans (those who are initiated and carryout Kriya Yoga) begin to see jyoti of different hues within the Kutastha. The Sadhaka is initially unable to accurately understand the spiritual meanings of these effulgent visions. In such situations the Sadhaka should ask and learn from the Divine Master the significance of such illuminations and obtain a meaningful explanation of luminosities manifested within the Kutastha. With advancement of yoga practices, the lotus in yogi's heart center gradually awakens and the unsteady life force slowly settles down to calmness in the heart center. While the life force becomes steady in the heart, gradually in the course of realizations and experiences, spiritual wisdom dawns within the sadhak yogi. When this stage becomes fully firm, the yogi becomes established in a state called 'steady in wisdom' (Sthitapragya). After arriving at the state of steady wisdom, fundamental principles-based

realized knowledge of visions manifested in the Kutastha reveals spontaneously in the Sadhaka through the heart. Then gradually the yogi achieves the stage of 'Sruti' (ability to 'hear' the universe). With support of this Sruti condition, yogis become capable arriving at an all pervading consciousness, after transcending all the layers or expanses of internal consciousness. At each of the five elemental all-pervading stages of consciousness or Chakras, the effulgent glow occurs as per the nature of the five elemental manifestations. For example, the Manipura (Navel Chakra) is the seat of Teja (Fire) element; so when a yogi's mind enters in that space, vision of a fire-colored form of Teja appears. The calm form of fire is blue colored. So some visualize the navel chakra as yellowish or fire colored. Again when the yogi reaches the all-pervading consciousness of Manipura, the yogi visualizes the Manipura in a bluish colored form.

The ambrosia from the Sahasrara can drip down to the tongue by the grace of the Divine Master even if the tongue knot has not been transcended. In the practice of Kriya Yoga or Brahmavidya there is a technique of enabling descent of the rays of the Aditya Mandala from the upper part of Sahasrara. If that is practiced, with impact of the great life force (Mahaprana), the lunar nectar situated in Sahasrara descends down. It only happens to the Sadhakas have innate spiritual samskaras of many previous lives of dutiful yogic practice. By the grace of the divine master, the door of shushumna opens up with a little effort for practitioners with innate capacity acquired by arduous practices and the sadhaka's internal pranayama flows very smoothly. Until pranayama flows within the central spinal channel (Shushumna), a yogi cannot have the vision and knowledge of internal expanses. The all-pervading consciousness is intricately embedded within an individual's personal inner space. This connect between the individual and universal is present in all Chakra mandalas. In creation, the collective cosmic consciousness situated in the seven space mandalas, manifest as individual consciousness in the expanse within Sadhaka's frame. The expanse of space within a Sadhaka's physical frame is the mirror of the mind. The space of Brahmanadi or Brahmamarg within the Shushumna is called Chidakash (sky of consciousness). By the divine grace of the Sadguru, when a Sadhaka is able to enter in this Chidakasha, then (s)he hears a very melodious note of a flute within. If one is able to carry on pranayama in this Brahmanadi, then during pranayama, notes of a flute become audible. In this situation breathing does not come out externally; it pulsates as vibrancy or 'Hansa' within the body. In this condition ajapa (automatic) japa (meditative repetitions of a mantra) spontaneously pulsates within the Sadhaka. This pulsation is the vibration of the true nature of the atma within the heart center, in the form of a self-cognition that stays in constant connect with the infinite. Yogis receive the close touch of the Supreme (Brahman) with the help of this vibration. The yogi reaches the stage of Samadhi whenever (s)he receives that connection of the Supreme. As a result of achieving constant communion with the Supreme, the yogi's consciousness expands within, mingling with the all-pervading infinite self-effulgence or Alakh-jyoti (Absolute-Infinite-Light) and the yogi becomes one with and akin-natured to the Supreme (Brahmaswarup).

From a spiritual view point, there are three serial stages of Sadhana, namely (a) purification of body and sense organs by religious austerities, (b) waning of the external maya influences by Prayanama and (c) enabling consciousness conducive for meditation

through withdrawal. Among these, constant gazed attempts to meditate within the resplendency in the sky between eyebrows along with ajapa japa are one of the easier paths. Yogis perform sadhana of Pragyan with the help of this contemplative process. The sadhana of Pragyan is to experientially realize the infinitude of the heart through the vibrating light pulsated by the mantra. Pragyan is the knowledge of realized truth. Ritambhara Pragya blooms from this Pragyan. The inner heart is the field of infinity; so when self-realized perception begins to express within the heart, the Sadhaka begins to possess infinite wisdom. To cross over the Akasha within the bounds of creation, enkindling of pragya located in heart is necessary. By a yogi's constant enthusiastic efforts, the impetuosity of mind needs to be contained by pragyan; only then will meditation or self-cogitation will become successful. For this reason Sadhaka's say "One cannot become a yogi if he is not unflinching in perseverance". Along with this deep physico-mental-psychic effort, steadfast concentration and unperturbed inward contemplation is required.

—Translated into English by Her Blessed Child **Dr Durgesh Chakrabarty**

The spiritual life proceeds directly by a change of consciousness, a change from the ordinary consciousness, ignorant and separated from its true self and from God, to a greater consciousness in which one finds one's true being and comes first into direct and living contact and then into union with the Divine. For the spiritual seeker this change of consciousness is the one thing he seeks and nothing else matters. **—Sri Aurobindo**

The Philosophy of Truth

The Proof of Unreality of the World

Chapter 10

Bhakta: O God! If this ephemeral world is unreal, then what is the use of judging karmas on the basis of sin and virtue, religion and unrighteousness? Self-willed people in that case, perform acts according to their sweet will.

Mahatma: My son! It is not enough to utter that 'the world is unreal.' When this sense of the unreality of the world becomes firm and unflinching in the heart, then people will naturally develop dispassion towards sinful and virtuous act or religious or irreligious act. In your boyhood when you were bereft of the knowledge of dolls, you had an intense desire of playing with them. In your adulthood, you have acquired full knowledge about dolls, so you have natural dispassion towards playing with dolls. Similarly, as you are totally ignorant regarding the nature of objects of this ephemeral world, you develop intense desire for this body made of bones and flesh and wealth, for which who perform even sinful acts. But the enlightened and the jnani has total detachment towards the worldly possessions and sense objects. When one is enlightened, then all his sense of sinful or virtuous act, righteous or unrighteous act, sorrow and bereavement completely disappear. Hence a jnani has transcended the world of duality and is completely liberated from this attachment.

...to be continued

(Excerpts from Sri Kalikananda Abadhoot's "Satya-Darshan" in Bengali)

-Translated into English by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

News in Brief

15th April - On the occasion of the Bengali new year, a lot of devotees visited the Ashram. Sree Sree Maa gave important spiritual advice to the devotees. The previous issue of Hiranyagarbha was released.

29th April - On the occasion of Buddha Purnima and Sri Sri Babaji Maharaj's statue installation anniversary, bhog was offered in the Ashram. In the evening Sree Sree Maa gave a short and profound discourse on Kriya Yoga. Like every year the spiritual question-answer session was conducted by our guru-brother Dr. Barun Dutta.

Sree Sree Maa at Sri Madavanandaji's Ashram

30th April - Sree Sree Maa alongwith some disciples visited the ashram of Sri Madavanandaji at Konnagar.

9th May - A Satsang was held at Akhanda Mahapeeth on the visit of Swami Chetanananda Giri Maharaj, a sage in the lineage of Paramhansa Yogananda.

17th June - On this day, the 27th session of the 'Adhyatmik Sabha' was organised at the Ashram premises. In this session, our Guru-brother Dr. Barun Dutta presented the 7th discourse on the Kathopanishad. The next Sabha will be held on 30th September.

28th June - Celebrating the birth anniversary of the earthly sojourn of Sree Sree Maa, Sri Sri Guru puja was conducted in the morning at Sree Sree Annapurna Kshetra. In the afternoon, devotees received prasad. Bhajans were presented by our Guru-brothers and sisters in the evening. The program ended with some beautiful devotional songs sung by Smt. Priyanka Chattopadhyay.

Forthcoming Events

Spiritual Discourse by Sree Sree Maa: 26th August, Sunday, at 11 am in the morning.

Janmastami: 3rd September, Monday at 7 p.m

Spiritual Congregation: 30th September, Sunday at 7 p.m

Mahalaya: 9th October, Tuesday

Navaratri Durga Puja: 10th to 19th October

13th Oct. (Panchami): Evening Programme

16th Oct. (Saptami): Evening Programme

17th Oct. (Ashtami) : Food distribution in the afternoon on the occasion of Lahiri Mahasaya's death anniversary.

18th Oct. (Navami) : Mahaprasad of Sree Durga Devi to be distributed in the afternoon.

Kojagari Laxmi Puja: 24th October, Wednesday

Subscription for Hiranyagarbha

Hiranyagarbha is a quarterly journal. The subscription fee for the journal in case of hand collection is **Rs. 80.00** and for postal delivery is **Rs. 100.00** per year (within India). Subscription forms may be obtained at the Ashram premises or by emailing to akhanda.mahapeeth@gmail.com. For information and help, contact Sri Arnab Sarkar (Mob. 094748-96776), Smt. Keya Chakraborty (Mob. 094324-56831), Sri Mohit Shukla (Mob. 094321-70365); Website : www.akhanda-mahapeeth.org.

হিরণ্যগর্ভের গ্রাহক হবার জন্য অথবা গ্রাহকত্ব পুণর্নবিকরণের জন্য
নিম্নের ফর্মটি পূরণ করে আশ্রমের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

Form No. .....

Akhanda Mahapeeth
Mata Sharbani Trust

Hiranyagarbha Subscription Form/Renewal Form

1. Subscription in Favour of (Name) : .....
2. Address : .....

.....

.....

3. Phone No. 1..... 2..... Email : .....
4. Period of Subscription : ☐ 1 year / ☐ 2 years / ☐ 3 years.

   From (Date) : ..... To (Date) : .....
5. Delivery Mode : ☐ Hand Collection / ☐ Postal Delivery.
6. Payment Mode : ☐ Cheque / ☐ Cash. Amount in Rs. .....

.....

Details of Cheque (drawn in favour of "Mata Sharbani Trust").....

.....

7. Checked by (Name) : .....

Signature :.....Date :.....

Publication List